"বন্দেমাতরম"
MAHISHADAL
RAJ COLLEGE
STUDENTS' UNION
আমিস্রাক্ষর
বর্ষপত্র - ২০২৩-২
ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ

স্বর্গীয় কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা
মহিষাদল রাজ কলেজ

অমিতাক্ষর

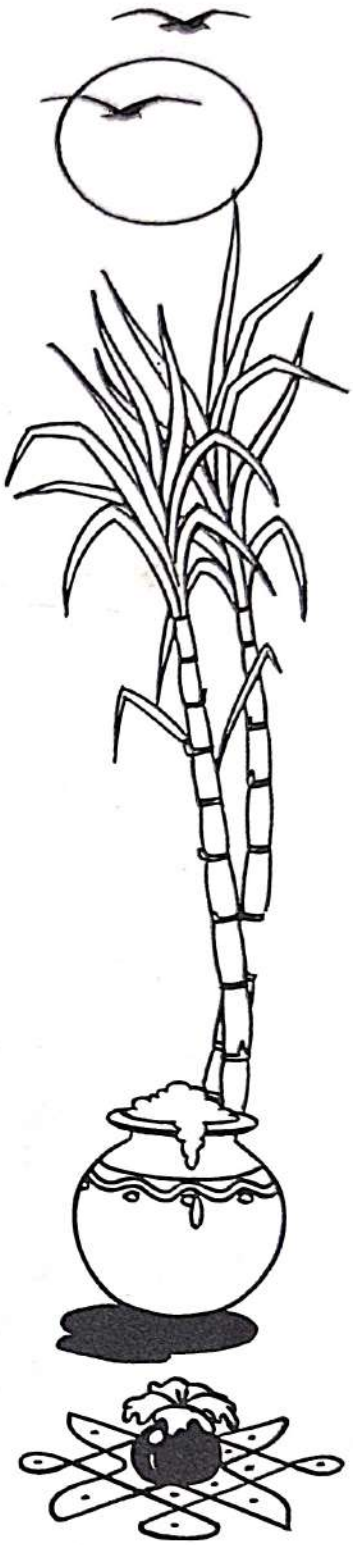

বর্ষপত্র- ২০২৩ - ২০২৪

মহিষাদল রাজ কলেজ

মহিষাদল ★ পূর্ব মেদিনীপুর

উপদেষ্টা

অধ্যাপক ড. গৌতম কুমার মাইতি

অধ্যক্ষ

মহিষাদল রাজ কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

সুরজিৎ দাস

সম্পাদক (পত্রিকা বিভাগ)

মৌসুমী ভান্ডারী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

কেয়া কুইতি

প্রকাশক:
শ্যামসুন্দর মান্না
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

প্রকাশকাল :
১৩ জানুয়ারি, ২০২৪
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুদ্রক :
সৃষ্টি ডি.টি.পি সেন্টার
ধারিন্দা রেল ক্রসিং, তমলুক
মোঃ-৯১২৬৫৬৪৭৫২

সেই সব প্রাক্তনী গুণীজনকে-

যাঁরা বিগতদিনে অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে আদর্শকে পাথেয় করে তরুণ জীবনের বহু প্রলোভনকে তুচ্ছ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে ছাত্র সংসদের দায়িত্ব নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে পথ হেঁটেছিলেন...

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা অনেকেই আজ কিছুটা ব্যস্ত হলেও কখনো ভুলে যাননি তাঁদের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মহিষাদল রাজ কলেজকে...।

Message

It gives me immense pleasure to know that the 44th Edition of "AMITRAKSHAR", the College Magazine of our college is going to be published on 13th January, 2024.

I commend the endeavour of the faculty members, non-teaching staff members, students, and all concerned which reflects the positive role played by the institution through various activities carried out during the entire academic session. I hope the magazine would not only provide an appropriate platform to the students to exhibit their creative ideas and literary skills, but also highlights their activities of the college.

On this occasion, I would like to convey my best wishes to all students, teaching and non-teaching staff of this college for the grand success of the "AMITRAKSHAR" by displaying the creativity of the dormant talents.

Dr. Goutam Kumar Maity
Principal
Mahishaldal Raj College

পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল ।বিধায়ক হিসেবে কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি হিসেবে এটি দ্বিতীয় বছর। আমি এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম । আজ এই পরিচালন কমিটির সভাপতি । আজও নিজেকে ছাত্র ভাবতে ভালোবাসি। প্রত্যেকটি ছেলে প্রত্যেক দিনের লেখাপড়ার পাশাপাশি আরও সৃজনশীল হয়ে উঠুক । তারা গানে লেখায় স্লোগানে নেতৃত্ব দানে বিজ্ঞানে ডিবেটে বক্তৃতায় একে অন্যকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাক। ওরা প্রতিষ্ঠিত হোক। শিক্ষা জগতে ওদের নাম উচ্চারিত হোক। বিগত বছরের থেকে এ বছর ম্যাগাজিনের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় যথেষ্ট আনন্দিত। তবে এটা সন্তুষ্টির কারণ নয় । এই মহাবিদ্যালয় ৮০০০ ছাত্রছাত্রী পড়ে তার মধ্যে মাত্র কয়েকজন কলম তুলে নিয়েছে । এটা ভারী দুঃখের । আরো অনেক বেশি বেশি কলম গর্জে উঠুক। সৃজনশীলতাই পারে মহিষাদলের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে।

পত্রিকা অমিত্রাক্ষর সংবেদনশীল রুচিশীল উদাহরণ হয়ে সমাজের বুকে বিরাজ করুক। অমিত্রাক্ষরের দীর্ঘায়ু কামনা করি

অভিনন্দন সহ
তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী
সভাপতি, পরিচালন সমিতি
মহিষাদল রাজ কলেজ

শুভেচ্ছা বার্তা

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে মহিষাদল রাজ কলেজের প্রকাশনী বিভাগের উদ্যোগে এবং ছাত্র সংসদ দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা "অমিত্রাক্ষর" আত্ম প্রকাশ করছে। ছাত্র সংসদের কাছে এ এক বড় চ্যালেঞ্জ হল বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কোমল হৃদয়ের অদম্য আবেগকে কীভাবে কাে লাগানো যাবে। আমাদের কলেজে অনেক ছাত্রছাত্রী আছেন যারা আমাদের কলেজের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের সমমানের লেখক লেখিকা যদি বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তার চেষ্টাও ছাত্র সংসদ করে চলেছে। আগামী দিনে হয়তো সফলও হবে। আমি ছাত্র সংসদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই এবং এই পত্রিকারও সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

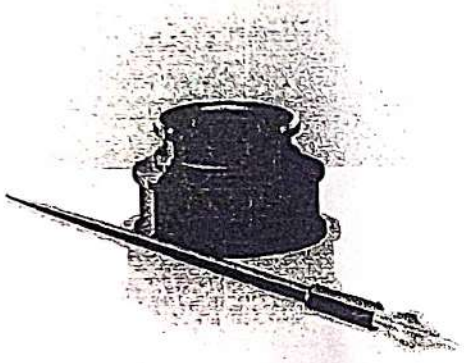

ধন্যবাদান্তে

অধ্যাপক সমীর কুমার পাত্র

বার্সার, মহিষাদল রাজ কলেজ

ছাত্রসংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কলমে

দেখতে দেখতে ২৩ টা বছর কাটিয়ে দিলাম মহিষাদল রাজ কলেজের বুকে। ২০০১ সালে যে দিনটাতে কলেজে যোগদান করতে এসেছিলাম সেদিনও ছিল কলেজের সোশ্যাল। অনুষ্ঠান চালাচ্ছে ছাত্র সাধারণ সম্পাদক মৃদুল দাস বায়েন। আমি দেখেছিলাম তার অসাধারণ সঞ্চালনা। রাজ কলেজের গ্রাউন্ডে সোশ্যাল ফাংশন। কলেজে ঢোকার আগে থেকেই সংসদের প্রতি আমার অন্তরের টান। অন্তরের সুতো বাঁধা হয়েছিল ঐ দিন থেকেই। আসলে আমার সমগ্র ছাত্র জীবন কেটেছে ছাত্র রাজনীতি করে। সমগ্র স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর আমি সরাসরি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কোন নোংরামি বা আপসের সঙ্গে নয়। আসলে নিজেকে যতটা না শিক্ষক বলে ভাবি তার থেকে বেশি ছাত্র বলে ভাবতে ভালো লাগে। ছাত্রদের কিসে আনন্দ কিসে সুখ কিসে ওদের কান্না পায় আর কিসে হাসি ফোটে সেটা ওদের গিঠে মাথায় হাত রাখলেই বুঝতে পারি। চোখে দেখলেই বুঝতে পারি ওদের আবদার এবং আকুতি। এই মহাবিদ্যালয় যোগদান করার আগে স্কুলেও বেশ কয়েকটা বছর পড়িয়েছি বলেই তাদের ওই শৈশব থেকে বয়সন্ধি হয়ে কলেজ স্তরে পা রাখার সময় তাদের মানসিক পরিবর্তন আমি টের পাই। এই বয়সে ওদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

এক সময় কলেজের নিয়মিত নির্বাচন হত। বেশ কয়েক বছর ধরে নির্বাচন বন্ধ আছে। তার কিছু ভালো দিক যেমন আছে মন্দ দিকও। ছাত্র সংসদ নির্বাচন যেমন বলিষ্ঠ নেতা তুলে আনত পাশাপাশি ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে ঘিরে যে মারামারির আবহাওয়া তৈরি হতো, রক্তক্ষয় - আবহাওয়া তৈরি হতো সেটাও আপাতত বন্ধ করা গেছে। যাই হোক হয়তো অচিরেই পুনরায় ছাত্র নির্বাচন হবে। তাই নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকলেও বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্য স্টুডেন্ট কাউন্সিল বা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আমাদের কলেজে আছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই আমি এই ছাত্র সংসদের বিভিন্ন ক্রিয়া-কল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছি এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

এই কাজ চালিয়ে যাওয়া যেসব ক্ষেত্রে খুব মসৃন হয়েছে তা নয়। বিশেষ করে টাকা পয়সা এডভান্স নেওয়ার ও খরচের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কলেজের এডমিনিস্ট্রেশন তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাধা দূর করে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছেন।

সংসদের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে এই বছর বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। কলেজের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়া-কল্পে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে ছাত্ররা। প্রতিক্ষেত্রেই তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ বছর সাংস্কৃতিক বিভাগে অনেকগুলি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তি করানো গেছে। এ বছর ম্যাগাজিন কে সম্পূর্ণ পিডিএফ বা ই ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বছর সর্বপ্রথম স্বরচিত গল্প স্বরচিত, কবিতা, স্লোগান, পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি কম্পিটিশন, পোস্টার কম্পিটিশন বিষয়কে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা গেছে।

সর্বোপরি বিগত বছরে সামগ্রিকভাবে একাডেমিক ও কালচারাল পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। কোনরকম ঝগড়াঝাটি মারপিট রক্তপাত ছাড়া ও এই যুগে একটি ছাত্র সংসদ সৎ ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার একটি অনন্য উদাহরণ মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ। এই ছাত্র সংসদের আরো নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা জাগুক। ওরা সত্যের পথে চলুক। প্রত্যেকটি সন্তান সুন্দর হয়ে উঠুক। ওরা কথাবার্তায় আরো বলিষ্ঠ হোক। ওরা সুনাগরিক হয়ে উঠুক।

অধ্যাপক ডক্টর শুভময় দাস
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক-ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ
মহিষাদল পূর্ব মেদিনীপুর

ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-সম্পাদক এর কলম থেকে

খানিকটা কুন্ঠা নিয়ে কলম ধরলাম 'অমিত্রাক্ষর' পত্রিকা পেরিয়ে এল বেশ কয়েকটা বছর। আমাদের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শুভময় দাস দীর্ঘদিন ধরে অতন্ত দক্ষতার সাথে পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। লেখা সংগ্রহের জন্য তাঁর নিয়মিত পরিশ্রম ছোটা-ছুটি, ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার মতো পরিশ্রমের কাজগুলি পাশের চেয়ারে বসে এতদিন দেখে এসেছি। আজ হঠাৎ করে গুরুভারের নিজের কাঁধ বদল হওয়ায় খানিকটা বিব্রতই বোধ করছি। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের নতুন অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় গৌতম কুমার মাইতি অনুপ্রেরণায় খানিকটা ভরসা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছি। আমাদের এই 'অমিত্রাক্ষর' পত্রিকায় মূলত লেখা দেন কলেজের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রীরা। পত্রিকার কলেবর খানিকটা আশা জুগিয়েছে সে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পত্রিকা ভবিষ্যতে আরোও সমৃদ্ধ হবে। ছাত্রছাত্রীদের কলম আরও বলিষ্ঠ হবে। এই পত্রিকা অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেলবন্ধনের পথকে মসৃণ করবে।

সুরজিৎ দাস
ভারপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্পাদক
ছাত্রসংসদ

শুভেচ্ছাবার্তা

দেখতে দেখতে আরো একটা বছর কেটে পার হয়ে গেলো। মনে হচ্ছে এই তো সেদিন লিখলাম 'অমিত্রাক্ষর' এর জন্য। ছাত্র সংসদকে ধন্যবাদ আরো একবার আমাকে কিছু লেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বাৎসরিক পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর'-এ। ছাত্রাবস্থা থেকে গল্প, কবিতা পড়তে ভালোবাসতাম কিন্তু চেষ্টা করেছে লিখতে পারলাম না, তাই যারা লেখে তাদের মনে মনে কুর্নিশ জানাই। আজকাল ছাত্রছাত্রীরা গল্প, কবিতা, নাটক, আঁকা, বিতর্ক ও অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেনা আমাদের মতো কিছু অভিভাবকদের জন্য যারা চাই আমাদের সন্তানরা শুধু পুঁথিগত শিক্ষার মান বাড়াক। কিন্তু গর্বের বিষয় আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য গঠনমূলক কাজেও পারদর্শী। 'অমিত্রাক্ষর' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রতি বছরই এই পত্রিকার গুণগত মান বাড়ছে আমাদের ছত্রাবস্থা থেকেই দেখে আসছি ছাত্রছাত্রীরা বাৎসরিক পত্রিকায় লেখা দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। তাই তো কলেজের কিছু প্রাক্তনী সাহিত্য জগতে যথেষ্ঠ সুনাম লাভ করেছেন। আশা রাখি বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে এই ধরা বজায় রাখবে।

সবশেষে 'অমিত্রাক্ষর' এর সফলতা কামনা করে আগামী বছরের লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদান্তে

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সম্পাদক, শিক্ষাকর্মী সংসদ

ও সদস্য, পরিচালন সমিতি

মহিষাদল রাজ কলেজ

সূচিপত্র

পত্রিকা - সম্পাদকের কলমে - মৌসুমী ভান্ডারী, শোভন মাইতি - ১২
সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ সেক সামিম ১৪
ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে - রাজদীপ হান্ডা ১৫
র‍্যাগিং বিরোধী সেলের সম্পাদকের কলমে - মৌমিতা বেতাল ১৬
সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে - শুভম অধিকারী ১৭
পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে
-সুমন পন্ডা, রিয়া দাস ১৮
ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ বিভাগ — সম্পাদক -এর কলমে
-সঙ্গম দাস, সেখ নিজাম মহম্মদ ২০
বৈজ্ঞানিক ছোঁয়ায় বিজ্ঞান পরিষদ -রিয়া দেবনাথ, সৌরভ মন্ডল ২২
NATIONAL SERVICE SCHEME সম্পাদকের কলমে -মনামি জানা ২৩
ছাত্র সংসদের সভাপতির কলমে - সৌমেন মাল ২৪
সহ-সভাপতির সাতকাহন -সেক রহিমুদ্দিন আলি ২৬
হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে -শ্যামসুন্দর মান্না ২৮
সহ সাধারণ সম্পাদকের সাতকাহন -শুভঙ্কর সাউ ৩১
রান্নাঘর নাকি ক্যানসারের আঁতুড়ঘর : সমস্যা ও সমাধান
-শুভময় দাস ৩২
বাদুড়গ্রাম ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ মানিক দাস ৪৪
নাছোড় জিদ্দি স্বর্ণ মানবী:- ম্যানগোল্ড -সুরেখা চৌধুরী ৫২
নার্সিং পেশার গতিধারা - অতনু মেট্যা ৫৪
ওদের প্যারেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট - সাগ্নিক মন্ডল ৫৬
সমাজের অবক্ষয় - শুভজিৎ প্রামানিক ৬০
হারায়ে খুঁজি -মৌসুমী হাজরা ৬২
মাঙ্গলিক - পারমিতা আদক ৬৩
সামুদ্রিক সিংহ - রচনা জানা ৬৪
ছাত্র সংসদ ছাত্র বন্ধু -রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৬৫
স্বাধীনতা-স্ব এর অধীনতা -অভিজিৎ মান্ডেঃ ৬৮
সম্মোহন -অম্বিকা গুছাইত ৭০
আমার কথা -নীলাদ্রী মন্ডল ৭১
পৃথিবীটা হারিয়ে যাচ্ছে নীরবে - শুভেন্দু জানা ৭১
কলেজ কিছু কথা - অর্ক শাসমল ৭২
মেলা - সুমন পন্ডা ৭২
রজনীর আত্মকথা -বৃষ্টি মহাপাত্র ৭৩
ARUNDHATI VIRMANI
SOVANA DANDAPAT 74
শঙ্খচিল -মোনালিসা মন্ডল ৭৫
প্রিয়জন - রিয়া দেবনাথ ৭৬
আজকের সমাজ - সঙ্গম দাস ৭৬
র‍্যাগিং - ছন্দা সামন্ত ৭৭
শিক্ষক দিবস - সুদীপ্তা দাস ৭৭
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া - সায়নী প্রধান ৭৮
এগারোর বাংলা - মৌমিতা মাহাত ৭৯
সারমর্ম - প্রশান্ত বেরা ৭৯
স্বরচিত কবিতা
প্রেম - নয়না প্রামানিক ৮০
প্রেম - দিশা কর ৮১
প্রেম - সুমন মাইতি ৮২
অনুগল্প
'কুসংস্কার' - দেবজিৎ সরকার ৮৩
'কুসংস্কার' - দিশা কর ৮৪
'কুসংস্কার' - সোমা রাণী মাইতি ৮৫
স্বরচিত গল্প
মুক্তমনা - 'এ বন্ধুত্ব প্রাণময়' সুমন মাইতি ৮৬
মুক্তমনা - "মা" - বিজয় দাস ৮৮
মুক্তমনা - "যদি আকাশে উড়তে পারতাম" -সোমা রাণী মাইতি ৯০

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

পত্রিকা - সম্পাদকের কলমে

হয়ত পাবনা ফিরে সবুজ মাঠে গোলেবসা আড্ডা
পাব না হয়ত তার ফিরে দুষ্টু-মিষ্টি খুনসুটি,
শত ক্যাম্পাসে চারিদিকে দেখবো তোমাদের চলাচল,
পাবনা তোমাদের, বিদায়ে চোখে আমার জল।

প্রিয় সবুজ সাথী,

প্রথমেই ছাত্র-সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পত্রিকা বিভাগের পক্ষ থেকে ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় আগত সকল নবীন ভাই-বোন, দাদা-দিদি, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও আমার প্রিয় সবুজ পরিবারের সকল সদস্য ও সদস্যাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিনম্রে প্রণাম জানাই।

ঠান্ডার প্রকোপ এখন একটু বেশিই। যখন বসে এই সম্পাদকীয় লিখছি, হাত ও আঙ্গুল গুলো বেশ জমাট বাঁধছে, সুতরাং বুঝতেই পারছেন কলম চালানো টা বেশ কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে, তবে নার্ভাসফিলতো বটেই, কারণ এর আগে যে কখনো লিখিনি তার মানের মধ্যে সেই কবিভাব টা আসেনি, তবুও দায়িত্ব ভার যখন আমার ওপর লিখতে তো হবেই, তাই শুরুটা করলাম সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা- আশা করবো আপনারা নিয়মিতভাবে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং বরাবরি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

নববর্ষ প্রতিটি মানুষের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। নতুন বছরকে সামনে রেখে ব নতুন বছরে পা দিয়ে মানুষ শপথ নেয় আগত দিনগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানোর। তাই আমরাও আর থেকে নতুন ভাবে শপথ নিলাম ও আমাদের মূলমন্ত্রে পূনরায় দিক্ষীত হলাম ৩টি মূল মন্ত্রে—

* শিক্ষার প্রগতি
* সংঘবদ্ধ জীবন ও
* দেশপ্রেম

"রাজ কলেজ" শব্দটার মধ্যেই কেমন রাজকীয় ব্যাপার রয়েছে তাই না? হ্যাঁ, রাজার এই কলেজ মোদের,

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্ত্বে।

আর এই রাজার কলেজের ছাত্র-সংসদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ "পত্রিকা বিভাগ"-এর গুরুদায়িত্ব ও বর্ষপত্রে লেখার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে খুবই ভাগ্যবান, আনন্দিত ও গর্বিত বোধ

মনে করছি। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে আমি অমার এই বিভাগের পক্ষ থেকে—

১। রাজলক্ষী

২। সর্বশ্রী

নামক দেওয়াল পত্রিকার প্রকাশ ঘটিয়েছি। আমি কখনোই এই তো বড়ো এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারতাম না, যদি আমার সবুজ ঘরের প্রত্যেকটি প্রিয় ভাই-বোন গুলো, দাদারা সহযোগিতা না করতো, ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোটো করবো না, আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একরাশ ভালোবাসা ও সম্মান রইলো।

আমার কলেজের ভেতর ছোট্টো ওই সবুজ ঘরটা শুধু একটা ঘর নয়, আমাদের "মা" আমার পরিবার, আর আমি আমার পরিবারের জন্য কতখানি করতে পেরেছি বা দিতে পেরেছি জানিনা, তবে সবুজ এই ঘর আমায় দু-হাত ভোরে ভরিয়ে দিয়েছে। শিখতে পেরেছি অনেক কিছু। শিখিয়েছে আমায় পড়াশুনার পাশাপাশি নিজের সহপাঠী ছাত্র-ছাত্রীর পাশে থাকতে সমাজের ভালো কাজের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকতে, সাধারণ দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে আরো কতো কি, শুধু বইয়ের পাতা পড়ে নয় বাস্ত জগত চিনিয়েছে একজন ভালো মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ এবং সঠিক।

শেষ বেলায় আমার আর কিছুই বলার নেই, নেই আর মনের ভেতরে গভীর জমে থাকা কিছু কথা। সকলের সাথে যেমন হাঁসি-খুশিতে মিলে-মিশে এসেছি তেমনিই সারাজীবন হাঁসি-মুখে থাকতে চাই।

অনেক কথা, অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, এবার দায়িত্ব ছাড়ার সময় এসে গেছে, যেতে হবে এবার আমায়, অতিথির মতো বিদায় নিতে হবে। মন তো মানছে না, কি করা যাবে সময় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার নামই জীবন, কেন জানি না, চোখ দুখানি থেকে জলের ফোটা পড়ছে খাতার পৃষ্ঠার ওপর, চোখে জল আসবেই না বা কেন, এই সবুজ ঘরটা যে আমার মা, এতদিন মায়ের নাড়ির সঙ্গে যে বন্ধন ছিল, সেটি যে আজ কেমন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যদি আর দেখা না হয়, আমায় মনে রেখো। আমায় চিরকাল পাশে রেখো, আগামী দিনের চলার পথে সুখ-শান্তির নীড় হয়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাবে, আর তখনই ভেসে উঠবে তোমাদের থেকে পাওয়া বুকভরা ভালোবাসার সুন্দর মুহূর্ত গুলো।

পরিশেষে সমাপ্তি বেলায় মনে পড়ে যাচ্ছে, কানে ভেসে আসছে বেজে বেড়াচ্ছে একটি গান, কবি জীবনানন্দের লেখা লাইন, আর সেই ছোট্টো কয়েক লাইন দিয়ে ইতি ঘটালাম।

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয় — হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
....
হয়তো বা হাঁস হবো — কিশোরীর — ঘুঙুর
রহিবে লাল পায়।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ—

শোভন মাইতি
পত্রিকা সহ-সম্পাদক

মৌসুমী ভান্ডারী
পত্রিকা সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ

প্রিয় সাথী,

কিছু লেখার পূর্বে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের সকল ছাত্রবন্ধু, অধ্যক্ষ মহাশয়সহ সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীসহ সকল শুভানুধ্যায়ীকে আমার অন্তরে অন্তঃস্থলে হতে অনেক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এবং ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

পূর্ববর্তী বছরের মতো মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ একটি বর্ষ পত্রিকা এবছরও প্রকাশ করতে চলেছে। পত্রিকার নাম- 'অমিত্রাক্ষর'। সেজন্য আমি মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদক হিসেবে বর্ষ পত্রিকাতে লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি। মহাবিদ্যালয় স্তরে আমার বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। হাতে রয়েছে আর মাত্র ৬ মাস, তারপর হয়ত অন্য কোনো মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেহ করব। এটা প্রকৃতির নিয়ম। রবীঠাকুরের ভাষায় যদি বলি—

"হেথা নয়, হেথা নয়,
অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

প্রত্যেকেই তার কৌশর জীবন ছেড়ে যৌবন জীবনে পদার্পন করতে হয়। জীবনের গতি মেনে স্কুল ছেড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয় আমিও কালের স্রোতের বাইরে নয়। মহিষাদল রাজ কলেজে আসি, একটি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে, স্বভাবতই সব কিছুই নতুন, নতুন পাঠ্য বই, নতুন মানুষ জন, নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা। সব নূতনের ভিড়ে আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই, তার পরেও ছাত্র সংসদ আমাকে তাদের সদস্য করেছে, বিশ্বাস করে বিশ্বাস ও আলাপন বিভাগের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছে। আমি জানি না, এই গুরু দায়িত্ব আমি কতটা, রক্ষা করতে পেরেছি বা পারব, তবে। আমি অনেক কিছু পেয়েছি। তবে কখনও কখনও মনে হয়েছে, এটা হলে ভালো হত, এটা করতে পারলাম না বা পেলামনা, তবে বিশ্বাস করি আমার না পাওয়া অভাব অভিযোগ একটা খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসলে এক কলমও লিখতে পারব না। কেন কোনো উত্তর নেই ছাত্র সংসদ সুযোগ দিয়েছে ভালোবাসা দিয়েছে, আবারও রবীঠাকুরের ভাষায় বলি—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলায় তলে,
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

সকলকে আবারও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। যদি কারও কাছে কোনো মুহূর্তে কোনো রকম ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা প্রার্থী।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ—

সেক সামিম

সভাপতি (আলাপন বিভাগ)

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

"গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা
স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

প্রিয় সবুজ সাথী,

প্রথমে জানাই মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রবিন্দুসহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকামন্ডলী শিক্ষা অনুরাগী প্রত্যেককে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন জানাই এবং নতুন ইংরেজী শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। আমি ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছি। মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ এবছরও বর্ষ পত্রিকা অমৃতাক্ষর প্রকাশিত করতে চলেছে। অমৃতাক্ষরের নব কলেবরে আমিও সুযোগ পেয়েছি কিছু কথা লেখার তাই নিজেকের গর্বিত মনে করছি।

কলেজ নিয়ে প্রত্যেকের জীবনে একটি আশা থাকে স্বপ্ন থাকে আমারও ছিল এবং তা পূরণ হয়েছে। কলেজ যাওয়া সবুজ ঘরকে ভালোবাসা এবং সবুজ ঘরের সদস্য হওয়া ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার পর ক্রীড়া সম্পাদকের ভূমিকাই আসা এ সবকিছুই বড় সুন্দর এসমস্ত কিছুর জন্য সংসদের সমস্ত দাদা, ভাই এবং বিশেষত সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, মঙ্গল দা, মনি দা, শ্যামসুন্দর মান্না সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসা জানাই।

করোনা পরিস্থিতির পরবর্তীতে পুরো কলেজকে খেলামুখী করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ছাত্রসংসদ ও আমার কাছে। কিন্তু তা সকলের সহায়তায় খুব সুন্দর ভাবে সম্পাদন করা গেছে এবং অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর খেলাতে বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রথম আমরা মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিল। যা সকল শিক্ষক শিক্ষিকাসহ ছাত্রবন্ধুদের কাছে অন্যতম উত্তেজনা পূর্ণ মুহূর্ত ছিল। এসকল সাফল্য আমি একার দ্বারা সম্ভব হতা না, সকলে সংঘবদ্ধ ভাবে আমরা এই সাফল্য পেয়েছি।

হ্যাঁ। সাফল্যের মাঝে হয়ত অনেক ব্যর্থতা ছিল মা হয়তা চাপা পরে গেছে সমস্ত কিছুর ভীড়ে। তাই আমার বিনীত অনুরোধ সকলের কাছে ক্রীড়া বিষয়ের কোনো রকম ভুল ভ্রান্তি, সমালোচনা বা কীভাবে পরবর্তীদিনে আরো ছাত্রছাত্রীকে ক্রীড়া অনুগামী করা সম্ভব হয় তা ছাত্র সংসদ কে জানান ছাত্র সংসদ এর যদি সম্ভব হয় তা নিশ্চয় ভেবে দেখবে।

সকলকে আবারো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বড়দের প্রণাম জানাই।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

রাজদীপ হান্ডা

মহিষাদল রাজ কলেজ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

র‍্যাগিং বিরোধী সেলের সম্পাদকের কলমে

আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি এভাবে আমাকে লিখতে হবে, কিন্তু কলেজ পত্রিকাতে লেখার সুযোগ পেয়ে সেটা আর হাতছাড়া করতে পারলাম না।

জীবনের ছোট্টো অধ্যায় পেরিয়ে একটা বড়ো অধ্যায়ে পা দিলাম। ২০২০ সালে ভর্তি হলাম মহিষাদল রাজ কলেজে, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগে এতো বড়ো পৃথিবীতে সবাই এতো তাড়াতাড়ি কীভাবে আপন হয়ে গেলো, বুঝতেই পারলাম না, সৃষ্টিকর্তার কী অপরূপ সৃষ্টি তাই না। তারপর এসে পড়ল সেই মহামারী। কেড়ে নিলো আমার কলেজ জীবনের একটা বছর। কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে আবার একত্রিত হলাম আমরা সবাই আজ থেকে প্রায় ২ বছর আগে আমি একজন দিদির হাত ধরে এই নতুন খবরটাতে প্রথম পা যেরখেছিলাম তারপর আস্তে আস্তে পরিচয় হল সমস্ত দাদা, দিদি ও সহপাঠীদের সঙ্গে। আর তারপর থেকেই বুঝলাম 'Student Union' টা কী! প্রথম প্রথম খুবই ভয় করতো Union এ যেতে। কিন্তু দাদা দিদিদের সঙ্গে থেকে আমার সেই বয়টা কেটে গেলো, একজন দাদার সহযোগিতায়- Union এর খাতাতে সাক্ষর করার সাহস পেলাম, যতদিন যেতে লাগল তত দাদা, দিদিদের থেকে কাজ করার উৎসাহ পেলাম, এবং জানতে পারলাম আমাদের 'Student Union' (ছাত্রসংসদ) সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিপদে পাশে দাঁড়ায়। কলেজে এসে ছাত্রীদের প্রধান সমস্যা হয় Ragging নিয়ে। আমি গর্বের সহিত বলতে পারি আমাদের কলেজে Ragging হয় না। তাই Ragging বিষয়টা কী সেটা অমাদের কলেজের মেয়েরা জানেই না। আমাদের Student Union শুধুমাত্র বিপদেই নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সর্বক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকে এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে। তারপর দাদা-দিদিদের আশীর্বাদে I.C.C. বিভাগের দায়িত্ব পেলাম। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পানল করে চলেছি। আমি সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি, সমস্ত বোনেদের পাশে থাকতে এবং ভবিষ্যতেও পাশে থাকার চেষ্টা করবো।

পরিশেষে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ছোট্টোলেখা শেষ করছি।

জয় হিন্দ বন্দেমাতরম

মৌমিতা বেতাল

র‍্যাগিং বিরোধী সেল সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

※ শিক্ষার প্রগতি ※ সংঘবদ্ধ জীবন ※ দেশপ্রেম

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

প্রিয় বন্ধুগন

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে, আসে বিদ্যামঠ তলে"

প্রতিবারের ন্যায় এক ঝাঁক ছাত্রের ভিড়ে মিশে যাওয়াটা বখাটে ছেলেটা মহিষাদল রাজ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জ্ঞান হওয়ার পর প্রবেশ করল মহিষাদলের ঐতিহ্যমন্ডিত রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ে। এই বখাটে ছেলেটা আর কেউ নয়। ছেলেটা হলো শুভম অধিকারী নির্বাচিত হয়ে আশা মহিষাদল রাজ কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শুভম অধিকারী।

তার পাঁচটা ছেলের মতোখাটে হলেও সবুজ রংয়ের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসার টান ছিল আমার রক্তজাত অধিকার। তাই মহিষাদল রাজ কলেজের সবুজ ঘরের প্রতি অস্পৃষ্ঠ হয়ে — কেই নিজের দ্বিতীয় বাড়ি বলে মেনে নিলাম এবং সংসদের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীকে নিজের পরিবারের সদস্যের মতো করে দেখতে শুরু করলাম।

ছোটোবেলা থেকেই বাড়ির সসদ্যদের দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে দেখে এবং সমলের নয়নের মনি যুবনেতা অভিষেক ব্যানাজি লড়াকু মনোভাবকে পাথেয় করেই আমার জীবনের পথ চলা। এই দুর্গম, বন্ধুর পথ চলতে চলতে বারবার হোঁচট খেলেই যিনি তাঁর সমস্ত হাত আমার দিকে প্রসারিত করেন। আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে তিনি হলেন আমাদের কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং মহিষাদল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে বিরক্ততজ্ঞ থাকব।

আমার জীবনে ২১ সংখ্যাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ২০০৪ সালে ১৬ এপ্রিল দিনটিতে আমি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পাই এবং ২০২২ সালে ১১ মে আমি মহিষাদল রাজ কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হই। ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক শহর মহিষাদলের সাংস্কৃতি প্ররায়ণ এই মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। মহিষাদল রাজ কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করার সময়ে আমাকে সবরকমভাবে সাহায্যে করেছে এবং সবসময় আমার পাশে থেকেছে আমার বন্ধুসম ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্যাম সুন্দর মান্না।

আমার লেখার শেষলগ্নে আমি মহিষাদল রাজ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী গৌতম কুমার মাইতি মহাশয় এবং কলেজের সমস্ত অধ্যাপক - অধ্যাপিকা ও আমার বাংলা বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী অমিতাভ মিস্ত্রি মহাশয় আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পানাম জানাই। আমি অপটু হাতে, অভিজ্ঞতার সহিত এবং কারও সাহায্য ছাড়াই একটুকু সারাংশ রচনা করেই, তাতে যদি কাউকে কষ্ট দিকে থাকি এবং সামান্য কিছু ভুল করে থাকি তার জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে সকল ভাই বোন বন্ধু-বান্ধবীকে ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে এবং সকলকে সবুজঘরের পক্ষ থেকে জাতীয়দাবাদী গৈরিক অভিনন্দন ও সংগ্রামী অনুবাদ জানিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম

শুভম অধিকারী

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

※ শিক্ষার প্রগতি ※ সংঘবদ্ধ জীবন ※ দেশপ্রেম

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ বিভাগ — সম্পাদক -এর কলমে

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই

প্রিয় সবুজ সাথী ঃ -

আমিও আর পাঁচটা ছাত্রের মতোই একটি সাধারণ ছাত্র। এক সাধারণ পরিবারের ছাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার আঙিনায় মহিষাদল রাজ কলেজের আসা, আর এই কলেজে এসেই পেলাম আমার নতুন পরিচয়, প্রথমে ভাবতাম ইউনিয়ন নামে শুধুই বাজে। ইউনিয়ন মানেই শুধু ঝামেলা, বিরক্তিকর, ওখানেই দাদাগিরি দেখায়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমার সেই সব ধারণা ভুল প্রমানিত হয়। আর পাঁচটা কলেজের ছাত্র সংসদের থেকে মহিষাদাল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ শুধু অন্য রকম। সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। দাদাদের সাহায্যে উৎসাহিত হয়ে এই সমস্ত কার্যকলাপে এগিয়ে এলাম। আর আমি উৎসাহিত্য হলাম যে অন্যদের ও সাহায্য করব্য। ছাত্র কল্যান সম্পাদক হিসাবে এই দ্বায়িত ধার আমার উপর দিয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। তারালা আমার সাহায্যে করলে আজ আমি এই জায়গায় আসতে পারতম না। আমি কৃতজ্ঞ থাকব আমার সমস্ত সহপাঠ্য, ভাই, বোন, দাদা ও দিদিদের যারা আজ আমাকে এই স্থানে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন।

** প্রতি বছরের মতো এ বছরও ছাত্র সংসদের অনুপ্রেরণ সেই বর্ষ পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতকায় লিখতে পেরে আমি গর্বিত, এবং আনন্দ বোধ করছি প্রথমেই বলেছিলাম মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ অন্যান্যদের থেকে আলাদা ঘরালার ও ভিন্ন ভাবনার। মহিষাদল রাজ কলেজে নিজস্ব লাইব্রেরি থাকার সত্বেও গরীব ও দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে ছাত্র সংসদ তার একটি নিজস্ব লাইব্রেরি প্রতিষ্টা যা ছাত্র কল্যান নামে পরিচিত। যার গুরু দায়িত্ব আমাদের হতে। এই বিভাগ বর্তমানে বছরে নতুন বই আনতে পেরেছি। যাতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। জানিনা কতটা কাজ করতে পেরেছি। কতটা সাহায্যে করতে গরীব দুস্থ ছাত্রীর পাশে দাঁড়াতে পেরেছি, ও সাহায্যে করতে পেরেছি। এটাই আমার জীবনের সার্থকতা 'পরিশেষে জানাব আমার প্রিয় স্নেহের ভাই। বোন সহপাঠি, দাদা, দিদি সবাইকে তৃনমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা এবং সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রনাম।

সেখ নিজাম মহম্মদ
সহ-সম্পাদক
ছাত্র কল্যাণ বিভাগ

সঙ্গম দাস
সম্পাদক
ছাত্র কল্যাণ বিভাগ

বন্দেমাতরম্

✳ শিক্ষার প্রগতি ✳ সংঘবদ্ধ জীবন ✳ দেশপ্রেম

বৈজ্ঞানিক ছোঁয়ায় বিজ্ঞান পরিষদ

"A person who never
Mode A mistake
Never tried anything New"

'মহিষাদল রাজ কলেজ' যা শুধু নামেই রাজ করে না, কাজেও রাজার মতো কাজ করে, যেমন তার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য এছাড়া লেখাপড়ার পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব দক্ষতার পরিস্ফুটনের সুয়োগ করে সারা দেশের মধ্যে রাজ করার সুযোগ করে দেয়। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ হল ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবযুক্ত প্রতিভা পরিস্ফুটনের বিভাগ, এই বিজ্ঞান পরিষদের অন্তর্গত প্রতিযোগিতাগুলি আয়োজন করে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ শিক্ষার প্রগতি করে, সংঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমকে উদ্মুক্ত করে। মহিষাদল রাজ কলেজকখনই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা প্রদানে বিশ্বাসা নয়। রাজ কলেজ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার পাশঅপাশি ব্যাপক অর্থেও শিক্ষা প্রদান করে। মহিষাদল রাজ কলেজ ও ছাত্র সংসদ যে কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে তা সত্যি অতুলনীয়, মহিষাদল রাজ কলেজের বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ হলো গর্বের বিভাগ, যেটা পার্থক্য করে দেয় অন্যান্য কলেজগুলির থেকে রাজ কলেজকে বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে পারে। গত কয়েকবছরের ন্যায় ২০২৩ এর বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিয়োগিতাগুলির সাথে অনেক নতুন বিষয় যোগ করা হয়েছে, যাতে এাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতভিাগুলি আমরা খুঁজে বের করতে পর, প্রতিবছরের মতো কুইজ, অঙ্কন, সংবাদপাঠ, বিতর্ক, তৎক্ষনিক বক্তব্য, প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি যোগ করা হয়েছে, বিজ্ঞানের স্লোগান রচনা, অনস্পট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, কি অদ্ভুতভাবে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের দক্ষতা সাথে প্রতিযোগায় অংশগ্রহণ করেছে এবং সুন্দরভাবে তাদের এই সুপ্ত প্রতিভা বাইরে এনে আমাদের সবাইকে অবাক করেছে। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগের অন্তর্গত প্রতিযোগিতাগুলি হল —

১) অঙ্কন
২) সংবাদপাঠ
৩) তাৎক্ষণিক বক্তব্য
৪) বিতর্ক
৫) প্রবন্ধ রচনা
৬) অন্তঃ মহাবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা
৭) বিজ্ঞানের স্লোগান রচনা

৮)অনস্পট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান দখলের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমান করেছে, সমস্ত ছাত্র, ছাত্রীদের আরও ভালোভাবে গড়ে ওঠার জন্য ও নিজেদের প্রমান করার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হতে সাহায্য করে ছাত্র সংসদ। মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ সম্পূর্ণ অভিন্ন তারা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের আয়োজন করে থাকে। অসংখ্যা ও অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই ছত্র সংসদের সমস্ত সদস্য, সদস্যাদের ও আমার প্রাণের দাদাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার আদর্শ প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ও শুভময় দাস মহাশয়কে, যিনি না থাকলে হয়তো আমি অনুষ্ঠানগুলি সঠিকভাবে সমাপ্ত করতে পারতাম না।

জানিনা কতটা পথ চললে পরে পথিক বলা যায়।
জানিনা কতটা পথ থাকলে পরে ভালো থাকা যায়
জানিনা কতটা পারলে পরে সব পারা যায়।

তাই যারা আমাকে এই স্থানের উপযুক্ত বলে মনে করেছে জানি না কতোটা তাঁদের মর্যাদা রেকে কাজ করতে পেরেছি। জানিনা কতটা মতো সম্পাদক হতে পেরেছি। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্ঠা করেছি। আশা করব পরের বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক আরও বিভাগকে প্রনোজ্জ্বল করবে ও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সর্বোপরি সবাইকে শুভেচ্ছা ও প্রনাম জানাই।

সৌরভ মন্ডল
(বিজ্ঞান পরিষদসহ সম্পাদক)

রিয়া দেবনাথ
(বিজ্ঞান পরিষদ সম্পাদক)

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

NATIONAL SERVICE SCHEME সম্পাদকের কলমে

'Not me but you'

আমি,

মনামী জানা ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী, আমি যখন প্রথম কলেজে আসি তখন আমকে NSS form টা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যি তখন NSS এর মানে টা বুঝতাম না। কিন্তু এখন আমার নিজের গর্ব হয় কারণ আমি একজন NSS department এর Volunteer।

আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার সিনিয়র দাদা দিদিদের কারণ তখন যদি ওরা আমাকে form টা না দিত তাহলে আজ হয়তো আমি NSS এর ছাত্রী হতে পারতাম না। প্রথম প্রথম সিনিয়র দাদা দিদিরাই যেমন মধুদা, নিলীমা দি রাই NSS Class নিত কিন্তু এখন আমাদের 4 টি Unit এ ভাগ হয়েছে। 4 Unit টি এর আলাদা আলাদা 4 জন Program Officer রয়েছেন। 4 জন Program Officer হলেন ডঃ প্রদীপ পাত্র, ডঃ জয়দেব মান্না, ডঃ বিভাস মিস্ত্রি ও প্রফেসর আবিদ আজাদ। ওনাদের প্রচেষ্টাতেই আবার NSS Unit নতুন করে শুরু হয়েছে। এবং এতে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

NSS হল ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত একটি পাবলিক সার্বিস প্রোগ্রাম। NSS সামাজিক মঙ্গল সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন NSS department -এ বহু ছাত্রছাত্রী Class করতে আসে। College এর নানারকম অনুষ্ঠান সূচিতে NSS ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এখানে বছরে 4 টি NSS Camp হয়, ইতিমধ্যেই 26.12.23 থেকে 01.01.2024 পর্যন্ত একটি Winter camp সম্পর্ণ হয়েছে। আমরা সবাই সেই NSS এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। Camp এ উপস্থিত ছিলেন 4 জন Program Officer ও আরো অনেক সম্মানীয় ব্যক্তিগণ। NSS থেকে কলেজ শেষে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যেটি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসংস্থানে সাহায্য করে।

পরিশেষে কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডঃ গৌতম কুমার মাইতি ও NSS Unit এর ৪ জন Programme Officer কে ধন্যবাদ জ্ঞাপ নকরেছি সাথে ছাত্রসংসদ, আমার সিনিয়র দাদা দিদি এবং সমস্ত Volunteers দের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার লেখঅটির সমাপ্তি করলাম।

জাতীয় গৈরিক অভিনন্দন সহ

মনামি জানা

সম্পাদক

N.S.S. বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

ছাত্র সংসদের সভাপতির কলমে

প্রিয় সবুজ সাথী,

আজ এই রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি হিসাবে বর্ষপত্র 'অমিত্রাক্ষর'-এ লেখার জন্য নিজেকে খুব আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি। কারণ এখানে আছে আনন্দ ও ভালোবাসা, আছে সৌভ্রাতৃত্ববোধ।

উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর ২০২১ সালে মহিষাদল রাজ কলেজে ইতিহাস বিভাগে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হই।

আজ বিদায় নেবার বাজনা যখন বেসুরো গীটারের ন্যায় যন্ত্রনা হয়ে বেজে ওঠে। তখন কণ্ঠটা জগদ্দল পাথরের ন্যায় ভাঙা হৃদয়-এ চেপে রেখে কঠোর বাস্তবটাকে প্রত্যক্ষ করি।

আমার মনে হয় অন্যান্য কলেজের ছাত্র সংসদের থেকে রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ একটু আলাদা। কারণ কলেজের প্রথম দিন গুলি থেকে কোনদিনই কোন দাদা-দিদি ইউনিয়ন করতে হবে বলে একথা বলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদৃশ্য ভালোবাসার বন্ধনে সবুজ ঘরটার সঙ্গে সম্পর্ক আবদ্ধ হল।

তারপর দাদা-দিদিরে কাছে কাজ শিখেছি। কাজ গুলো সময়ের অবকাশে দিনগুলি কাটিয়ে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে দাদা-দিদি ও সহপাঠী, ভাইবোনদের সাহায্যে ও সমর্থনে আমি সভাপতির পদে এলাম।

আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি ছাত্র মানে কি? শুধু পড়াশোনা ও প্রতিদিন কলেজে আসা ও যাওয়া? কিন্তু আমার মনে হয় এর বাইরে একটি জগৎ রয়েছে ছাত্র সমাজের একটি ছাত্র মানে আগামীর প্রতীক? ভবিষ্যতের দিশারী যুব সমাজ, জাগরণের প্রতীক ছাত্র সমাজ, দিশাহীন পথ নয়, পথের মাঝে তারা পথ খুঁজে পায় আগামীর ঠিকানা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা তোমার ধর্ম নয়, তোমার ধর্ম সমাজকে মুক্ত করা, এস না বন্ধু মুক্ত করি তাকে এস না সবাই কণ্ঠে বলে উঠি—

রণ বিদ্রোহী আমি ক্লান্ত, সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রেল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ ভূমি রনে।

ছাত্র সংসদের উত্তরসূরী হিসাবে এই সুবিশাল ঐতিহ্য ও তার সুনাম কতটা রক্ষা করতে পেরেছি এবং সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কী করতে পেরেছি বিচারের দায়িত্ব তোমাদের। যদি কোন দিন নিজের অজান্তে আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

শেষবেলায় কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও কলেজের শিক্ষাকর্মীদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ছাত্র সংসদের সদস্য ও সদস্যা, শুভানুধ্যায়ী ও সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জানাই ভালোবাসা। আজ তোমায় অতিথির মত বিদায় নিতে হচ্ছে। এরপর গ্রীষ্মের দাবদাহে, বর্ষার থৈ থৈ জলের আলপনায়, শরতের সকালে, হেমন্তের পাতা ঝরনায়, শীতের শিশির বিন্দুতে কিংবা বসন্তের রঙিন বাহারে খুঁজে বেড়াব তোমাদের ভালোবাসা, সৌহার্দ্যতা, সৌভ্রাতৃত্ব, স্নেহ, সহমর্মিতা, প্রীতি যা আমার আগামী দিনের চেলার পথে আনন্দ সুখ শান্তির নীড় হয়ে বেঁচে থাকার রসদ যোগাবে। আর ঠিক তখনই ভেসে উঠবে তোমাদের থেকে পাওনা অপূর্ব সুন্দর অতীত গুলি।

যাবার সময় ঘনায়ে এসেছে
তাইতো চলেই যাব
বিদায় বেলার কান্না চাপিয়ে
স্মৃতির পাতা উল্টাব।

জাতীয় গৈরিক অভিনন্দন সহ

সৌমেন মাল

সভাপতি

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

সহ-সভাপতির সাতকাহন

আমি রহিমুদ্দিন। যখন আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করলাম ঘাসিপুর বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির হাইস্কুল থেকে। তারপর ভেবে পেলাম না পড়া কি চালিয়ে যাব না বন্ধুদের সঙ্গে কাজে চলে যাব। তারপর শেষে ঠিক করলাম, বাড়িতে কাউকে না বলে কাজে চলে যাব, শেষ পর্যন্ত একদিন চলেই গেলাম। বাড়ির সকলেই চিন্তাতে রইল। বাড়ির সকলেই ভাবল কোথায় যেতে পারে। তারপর সেই স্কুল ছুট বন্ধুরা এসে বাড়িতে বলল সে তো কর্মসূতের বাহিরে চলে গেছে। বাড়ির সকলে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় রইল তারপর আমার বাবা ও কাকু আমাকে ফিরিয়ে আনতে গেল গুজরাটের সুরাট থেকে। বাড়ি ফিরতেই সকলেই জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করতে লাগল। আর একজনের কথা না বললেই না তিনি আমার মা, ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। তার পর মা সুস্থ হওয়ার পর মা ও বাবাকে দুজনে ডেকে আমাকে বলল তোমাকে কলেজে ভর্তি হতে হবে। তারপর ঠিক করলাম মহিষাদল রাজ কলেজে ভর্তি হব। ভর্তি হওয়ার জন্য যখন জানতে গেলাম, গিয়ে দেখলাম ভর্তির শেষ তারিখ চলে গেছে ও কলেজ দু-সপ্তাহের মতো হয়ে ছুটি পড়ে গেছে। তারপর অনেক ঘাম ঝরিয়ে যোগাযোগ করলাম মহিষাদল রাজ কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ কুইল্যা মহাশয়ের সহিত। শেষ মেষ ভর্তি হলাম সাধারণ বিভাগের ছাত্র হিসাবে। তারপর শুরু হল আমার কলেজ ছাত্রজীবন। তার কয়েকদিন পর পরিচয় হল কমনরুমের মধ্যে মহিষাদল রাজ কলেজের সাধারণ সাম্পাদক (ছাত্র সংসদের) রোহিত মন্ডলের সহিত। আস্তে আস্তে করে প্রতিদিন কলেজ যেতে শুরু করলাম। কলেজের সবার সহিত পরিচয় হল। যাওয়া শুরু করলাম সবুজ ঘরের। এবং কিছুদিন পরে শুভানুধ্যায়ী হলাম। একের পর এক ছাত্র সংসদে প্রায় সব কাজেই সহযোগিতায় হাত বাড়ালাম, দেখতে দেখতে কলেজে নবীন বরণ থেকে সব ধরণের অনুষ্ঠানে আনন্দ করতাম। তার এক সপ্তাহ পর আমাদের জয়ের বিজয় মিছিল বের হয়েছিল এবং তাতে সবুজ আবীর মেখে মুখ আনন্দ করেছিলাম। তারপরের দিন অর্থাৎ ২১ মে ভাবতেই পারিনি ছাত্র সংসদের এক ছোট্টো সদস্য সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হব বলে। তারপর কলেজের সেই দুই দাদা না থাকলে আর হয়তো ছাত্র সংসদের কোনো কাজ শিখতে পারতাম না, শুভজিৎ দা, প্রশান্ত দা, রোহিত দা, প্রকাশ দা, অতন্দু দা, নীলাদ্রী দা ও জোউল দা। বন্ধুদের ভালোবাসা ও মিষ্টি রহিমুদ্দিন। আমার কলেজ জীবনের চলার সাথী হয়েছিল। সে তার বন্ধুতের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছাত্র-সংসদে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করত। নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমার প্রিয় দাদা-ভাই প্রশান্তদার হাত ধরে। জানিনা সব দায়িত্বের কাজ ঠিক-ঠাক পালন করেছি কিনা? এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলাম যে ৩৬৪ দিন তাদের

পাশে সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকার। নিজ শ্রম-নিষ্ঠা-সততা নিয়ে সাহায্য করলাম ছাত্রছাত্রীদের এবং সেই দায়িত্ব আমি কতটা পূরণ করতে পেরেছি তার বিচারের দায়িত্ব তোমাদের। যদি কোন ভুল করে থাকি ক্ষমা করে দিও।

সবশেষে বলি তোমরা সবাই থেকে শত ঝড় ঝাপটা এলে মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদকে ভালোবাসা এবং পরিশেষে যাদের কথা না বললেই নয় তারা হল সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, মঙ্গল দা, অতনু দা, রহিত দা, প্রকাশ দা, মনি দা, রেজাবুল দা, প্রশান্ত দা, পাপাই দা আর সেই দাদা আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সর্বশেষ না বললে হয়ত আমার ছাত্রজীবনের সবথেকে বাধা হয়ে দাঁড়াবে মাননীয় শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাই।

"সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে
জানি না কবে কোথায়
পড়বে নাই বা কেন
তোমরা যে আছো আমার হৃদয় জুড়ে।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ—
সেক রহিমুদ্দিন আলি
সহ-সভাপতি সম্পাদক
ছাত্র সংসদ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে

হে সবুজ মায়ায় পড়ে গেছি
সবুজ শোভায় আপনারে হারিয়েছি,
সবুজ পল্লব, সবুজঘাস
এরই মাঝে বেঁধেছি বাস।

জীবনপঞ্জির স্বর্ণ মুহূর্তে লেখনী পত্রে কিছু রঙবেরঙের কালি নিয়ে হাতে দক্ষ লেখকের মতো লেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু লিখতে পারিনি কবির ভাষায়। লিখতে পারিনি আমার ওপর থাকা অনেকের আহা। শুধু উদ্দেশ্যেই আমার শ্রদ্ধা যাদের সহযোগিতায় আমি আমার স্বর্ণময় সময় গুলি অতিবাহিত করতে পেরেছি, ছন্দহীন শব্দ অর্থহীন ভাষাকে জড়ো করে প্রথমেই সকলের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করি।

প্রথমেই বলি আমি কোন লেখক নই। আমার প্রাণের কলেজে প্রতি বছর একটি বর্ষপত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হয়। শুরু করবো কীভাবে খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক ২০২১ সালে বাড়সুন্দরা হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি আমি। তারপর বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও মহিষাদল রাজ কলেজ কেই পছন্দ হয়। এবং কলেজের ফর্মফিলামের শেষ দিন ফর্ম ফিলাপ করি আসলে আমি সেরকম ভাল ছাত্র ছিলাম না। তারপর বি.এ. (জেনারেল) ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হই।

এবার একটু নিজের কলেজে কাটানো দিন গুলো সম্পর্কে বলি। প্রথমেই বলে রাখি আমি একটু ফাঁকি মারতাম বেশি আর একটু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতাম প্রচুর। আসলে আমার কলেজে ভর্তি হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার এক বন্ধুর থেকে চ্যালেঞ্জ জিতব। কারণ আমার এক বন্ধু বলেছিল যে আমিনাকি মহিষাদল রাজ কলেজে ভর্তি হতে পারবোনা আর আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি ভর্তিও হবো এবং এমন একদিন আসবে যে তোরা আমায় বলবি ভাই একটু আমার হেল্প কর। সে যাই হোক কলেজের প্রথম দিন ভেরিফিকেশন এ গেলাম এবং প্রথমেই গিয়ে ডিটলেরেশন ফর্ম এর জন্য গেলাম সেই স্বপ্নের সবুজ ঘর ছাত্র সংসদে তারপর ফর্মটির ফিলাপ করে লাইন দিই বয়েজ কমনরুম এর পেছনে মানে নিউ বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে, যাইহোক প্রচুর পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছিলো কিন্তু মনে মনে প্রচুর বেশি খুশি ছিলাম কারণ আমি চ্যালেঞ্জ জিতে গেছি। তার পর দেখা হয় এমন এক মানুষের সাথে যার সাথে কিনা আমার রক্তের সম্পর্ক তা আমি জানতামই না, সেই মানুষটা আর কেউ না সে হল অরিন্দম দা ওই আমার প্রথমে ছাত্র সংসদে আসার জন্য বলে এবং আমাকে আস্তে আস্তে করে বলে সবকিছু ছাত্রসংসদ কেন হয় কলেজ এর মধ্যে। যাই হোক শুর হোল পথ চলা এই পথচলার আমার এক সঙ্গীও হয়ে যায় মানে এমন এক বন্ধু পাই যাকে বন্ধু নয় এক কথায় ভাই বলা যায় তার নাম পিয়াস সত্যি ও আমার এতটাই কাছের হয়ে যায় কিছু দিনের মধ্যে তারপর আমি আর আমার ভাই পিয়াস মিলে ছাত্র সংসদের দাদাদের আদেশ অনুযায়ী দাদাদের সাথে কাজ করতে থাকি। আমার আর আমার ভাই পিয়াসের একটি

বদরোগ ছিল সেটা হল রোজ নিয়ম করে ক্যান্টিনে যাওয়া। যাইহোক দাদারা আমার একটা দায়িত্ব দিলো আলাপন বিভাগের আমি ওখান থেকেই আমার কলেজ এর ছাত্রছাত্রীরা চেনে এবং তারপর যার সঙ্গে পরিচয় হল সে আর কেউ নয় সে হল প্রশান্ত দা। যাইহোক আমি সত্যি সবদাদাদের কাছে একটু হিরো ছিলাম। যাইহোক তারপর ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে সিনিয়ার দাদারা আবারো এক দায়িত্ব দেয় ছাত্রছাত্রী কল্যাণ বিভাগের সহ-সম্পাদক আর আমার সম্পাদক ছিল পলাশ দা। যাইহোক পলাশদা সম্পাদক ছিল বটে কিন্তু, কাজ গুলো আমিই করতাম। দাদাদের দেওয়া দায়িত্বটা আমি আর পলাশদা খুব ভালো করে সামলাই। আর একটা কথা না বলে পারছিনা এই ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ বিভাগ ছিল আমার অহংকার। আমাদের কলেজে ছাত্রসংসদের যেমন বাঙালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বন হয় তেমনই হয় ছাত্র সংসদের ১২ মাসে বিভিন্নরকমের অনুষ্ঠান এরকমই কাটতে থাকে আমার কলেজ জীবন তারপর একদিন দাদারা মিলে একগুরু দায়িত্ব ছাত্র সংসদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব "সাধারণ সম্পাদক" এর দায়িত্ব আমায় সমর্পন করে। দিনটা ছিল ১৫ই মে ২০২৩। এই দিন থেকে শুরু হয় আমার এক নতুন জীবন। প্রথমেতো নিজেই ভেটে উঠতে পারছিলাম না যে কিভাবে সামলাবো এতো কিছু। ওই যে কথায় আছে না বিপদে পড়লে ভগবান সয়ং আসেন তোমার কাছে। হ্যাঁ সত্যি প্রশান্ত দা, সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, রোহিত দা, সকল সিনিয়ার দাদারা আমি যখন যা হেল্প চেয়েছি ছাত্র সংসদ চালানোর জন্য সবাই খুবই হেল্প করেছে। দায়িত্ব যখন দিয়েছে দাদারা পালন তো করতেই হবে। তাই লেগে পড়লাম দায়িত্ব সামলাতে। তারমধ্যে বলে রাখি সত্যি কথা বলতে ছাত্র সংসদের সবারই এই স্বপ্নটা থাকে "সাধারণ সম্পাদক" হওয়ার আমারও ঠিক ছিল স্বপ্নই। আর আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করেছি ওই চেয়ারে বসার আগে অনেক স্বপ্ন দেখেছি ওই যায়গাতে বসে কিকি করবো। আর একটা কথা সবসময়ের জন্য ভেঙে আসছি যে কোনদিন কোন ছাত্রছাত্রী আমাদের এই সবুজ ঘর থেকে খালি হাতে ফিরবেনা। হ্যাঁ আমি সেটা পেরেছি। এটা পারতে আমায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সবসময় সে আর কেউনা সে আমার দাদা প্রশান্ত দা। যাইহোক আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর তোমাদের জন্য যা করতে পেরেছি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি—

১) দীর্ঘ কয়েক বছর বছর বন্ধ থাকা ছাত্রসংসদ আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একবছর করতে পেরেছি।

২) দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকা ছাত্র সংসদ আয়োজিত শর্ট ট্যুর এবছর করতে পেরেছি।

৩) পেরেছি দুতালাতে জলের ব্যবস্থা করতে।

৪) পেরেছি দুতালাতে বাথরম ঠিক করতে।

৫) পেরেছি "বিদ্যাসাগর হল' টাকে নতুন করে সাজাতে।

৬) পেরেছি "বয়েজ কমন রুম' এ নতুন কেরাম বোর্ডএর ব্যবস্থা করতে।

৭) পেরেছি 'বয়েজ কমন রুম' এ টি.টি বোর্ডের ব্যবস্থা করতে।

৮) পেরেছি ছাত্রসংসদ এক বছরের ফ্রি ওয়াইফাই সিস্টেম।

৯) পেরেছি আমাদের কলেজের সেন্ট্রাল কম্পিউটার সেন্টার করতে।

১০) নিউ বিল্ডিং এ ফায়ার এবং জল এবং ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছি অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে।

১১) আমাদের কলেজ এ একটা মাত্র কক্ষ আছে, ওই কক্ষে সবথেকে বেশি ছাত্রছাত্রী রোজ যাওয়া আসা করে মনে আমাদের স্বপ্নের ঘর সুবজ ঘর অর্থাৎ ছাত্রসংসদ টাকে আরো ভালো করে সাজানোর দাবি জানিয়েছি অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে।

ছাত্র সংসদের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা গুলি সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য। ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শুভময় দাস, ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সন্দীপ বর্মন, সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা নবনীতা বাগ মাইতি, পত্রিকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুরজিৎ দাস, এবং আলাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা দেবলিনা ম্যামকে কৃতজ্ঞ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই ছাত্র সংসদের বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের।

আমার পরিবার অর্থাৎ ছাত্রসংসদের মুখপাত্র আমি, এছাড়াও আমার পরিবারের অর্থাৎ ছাত্রসংসদের সভাপতি সৌমেন এবং সহ সভাপতি রহিমউদ্দিন ও সহ সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর ভাই ও আমার পরিবারের অভিভাবক যারা, যাদের কথা না বললে হয়তো আমার এই লেখাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

আমার অভিভাবক তিলক কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে এবং সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, মঙ্গল দা, মোনি দা, প্রশান্ত দা, প্রকাশ দা, নিলাদ্রী দা, রেজাউল দা, তন্ময় দা, সূর্য দা, সায়ন দা, রোহিত দা, রূপম দা, পাপাই দা, অরিন্দম দা, বিপুল দা, সিদ্দিক দা, বিট্টু দা, পলাশদা, সোহম দা, ত্রিপতস দা, সদস্য ও সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের যথাযগ্যে স্থানে সম্মান ও আমার ভালোবাসা জানাই।

আমার সোনার সংসার আমায় যা দিয়েছে তার ঋণ হয়তো আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ ছাত্র সংসদের কাছে আমার এক প্রতিজ্ঞা ছাত্র সংসদের গায়ে আমি এতটুকু অ্যাঁচড় লাগতে দেবো না, জীবনে কোনোদিন।

পরিশেষে সকলে তথা মহিষাদল রাজ কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বলবো আমার লেখায় যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকে নিজের বাড়ির সন্তানের মতো ক্ষমা করে দিও। সকলের শুভ কামনা করে আমি আমার লেখা শেষ করছি।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ-

শ্যামসুন্দর মান্না

সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র সংসদ

মহিষাদল রাজ কলেজ

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

সহ সাধারণ সম্পাদকের সাতকাহন

প্রিয় সবুজ সাথী,

সকলকে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সকলে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও মহিষাদল রাজ কলেজ অমিত্রাক্ষর নামে বর্ষপত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। যার প্রকাশক ছাত্র সংসদ। তাই আমি ছাত্র সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক 'অমিত্রাক্ষর' পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছি। এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি।

সত্যি বলতে আমি সেই মাধ্যমিক লেভেল হতে মনে মনে ভাবতাম বাড়ির পাশের কলেজে ভর্তি হব এবং ছাত্র সংসদ করবো। সেই মতোই উচ্চমাধ্যমিক স্তর পাশ করার পর মহিষাদল রাজ কলেজ এলাক সবুজ ঘরটাতে প্রবশে করে সকল ছাত্রবন্ধুদের সাথে ডাইসে যাওয়া, দাদাদের হোক শিক্ষা নিতে নিতে আজ মহিষাদলরাজ কলেজ এর সহসাধারণ সম্পাদক হলাম। প্রতিনিয়ত সেই পদ এর যথাযথ সন্মান রার করার চেষ্টা করে থাকি। জানিনা কলেজ বা ছাত্র সংসদকে কতটা কি দিতে পেরেছি। কিন্তু একথা এক বাক্যে স্বীকার করি যে আমি অনেক পেয়েছি। যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। দাদা, দিদিদের ভালোবাসা, শিক্ষকদের স্নেহ সবকিছু কোনোদিন ভোলার নয়। এককথায় সবার সব ঋণ আমি শোধ করতে পারবো কিন্তু আমার মায়ের ঋণ ও ছাত্র সংসদ এর ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। মাটির কাছে ধার করেছি রং, নটের কাছে ধার করেছি ভঙ্গি, বাষার কাছে ধার করেছি বাক্য, আর ছাত্র সংসদ থেকে ধার করেছি মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ছাত্র সংসদে না আসলে হয়তো আমি একজন ছাত্র হয়ে আর এক ছাত্রবন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতাম না, সুযোগ হতো না মহান মহান Galaxy বা বোধমন্ডলীর সংস্পর্শে আসার। সুযোগ হতো না সংস্কৃতিকে আরো কাছ থেকে ছোঁয়ার।

সবুজ ঘরটা এক একটা ছাত্র বন্ধুর জীবনে অনেক বড় পাওয়া। অমিত্রাক্ষর একজন সদস্য হতে পেরেছে এটা অনেক আমার কাছে।

তবে এটা বলতে পারি মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ আর পাঁচটা ছাত্র সংসদের নয়, এখান থেকে অনেক শেখার কাছে, বোঝার আছে।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ

শুভঙ্কর সাউ

ছাত্রসংসদ সহসাধারণ সম্পাদক

রান্নাঘর নাকি ক্যানসারের আঁতুড়ঘর : সমস্যা ও সমাধান

শুভময় দাস
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

কলেজে পড়ানোর সময় যখন ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, "স্যার উচ্চমাধ্যমিক পড়াকালীন আমাদের স্কুলে ল্যাবরেটরীতে বিশেষ করে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি আমরা দেখিইনি। একটা দিনের জন্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয়নি। একটা দিনের জন্য আমরা কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে যাইনি। আমাদের কি দোষ বলুন!"

আমরা এমন স্কুলে পড়েছি বা পড়াচ্ছি তার প্রত্যেকটারই একই হাল। এখন কোন স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় প্রাকটিক্যাল হয় না। এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই । এটাই বাস্তব ঘটনা । ছাত্রদের অভিযোগ নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু তাও বিষয়টাকে নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবে ভেবে দেখতে বলছি । আসুন একটু অন্যরকম ভাবে ভেবে দেখি ।

সত্যিই কি ছাত্রছাত্রীরা কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরীতে ঢোকেইনি। না । আমার ভাবনায় প্রতিনিয়ত ওরা ঢোকে-কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরীতে।

কিভাবে ? আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটি বাড়ি এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক ল্যাবরেটরি।

আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে অনেক ঘর আছে - শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, চানঘর, সাজঘর, গানঘর, বিদ্যাঘর-। এর মধ্যে ভেবে দেখেছেন - এগুলোর মধ্যে আমাদের বাড়ির রাসায়নিক ল্যাবরেটরি কোনটি? কোথায় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ঠাসা আছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি ঘর হল রান্নাঘর চানঘর এবং সাজঘর বা ড্রেসিং টেবিল। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে রান্নাঘর এক বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের স্টোর হাউস। বিভিন্ন ধরনের তেল, বিভিন্ন ধরনের মশলা প্রত্যেকেই এক ধরনের অর্গানিক কেমিক্যাল। হলুদ লঙ্কা চা চিনি পেঁয়াজ আদা রসুন ধনে মৌরি জিরে লবঙ্গ এরাও । এরপরে বিভিন্ন ধরনের ফুড কালার , বিভিন্ন ধরনের প্রিজারভেটিভ , ভিনিগার কি নেই সেখানে! তারপরে বাসনপত্র , হাঁড়ি কড়াই গামলা হাতা খুন্তি বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের কন্টেনার , সেরামিকের কন্টেনার আরো কত কি! মশলা শুধু নয়, মশলা রাখার প্লাস্টিকের কৌটো কন্টেইনার সেও তো এক ধরনের রাসায়নিক। রান্নাঘরের প্রতি নিয়ত ধোঁয়া ধুলো শিশি বোতল সবই বিশেষ বিশেষ রাসানিক পদার্থ। বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট থেকে ডিস ওয়াসার ভীম লিকুইড সেও বিচ্ছিরি রকমের রাসায়নিক। চাল চিনি থেকে চা, কফি থেকে কেরামেল কর্নফ্লেক্স অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল থেকে ফুড কালার সবই তো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক । এমন কি তরকারি রং করবার জন্য যে কাশ্মীরি লাল লঙ্কা মেশানো হয় অথবা রং করার জন্য জাফরান রং মেশানো হয় সবই তো বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ।

এরপর দ্বিতীয় রাসায়নিক ল্যাবরেটরি হচ্ছে মায়ের সাজঘর ড্রেসিং টেবিল এবং বাথরুম। সাজঘরের বিভিন্ন ধরনের লিপস্টিক নেলপালিশ, রুমফ্রেশনার্স এয়ারফ্রেশনার, বিভিন্ন সাজের দ্রব্য প্রত্যেকটাই অজৈব রাসায়নিক এমনকি। হেয়ার কালার শ্যাম্পু কন্ডিশনার টুথপেস্ট বিভিন্ন রকমের সাবান সবকিছুই ভয়ংকর অজৈব কেমিক্যাল। তাই ছাত্রদের প্রতি আমার সাধারণ উত্তর "তোমরা

প্রতিনিয়তই কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরীতে যাতায়াত করছো। এবার জিনিসটাকে একটু অন্যরকম ভাবে ভেবে দেখো।" হ্যাঁ এরপর ভেবে দেখবার পালা।

এই রান্নাঘর যেটা কিনা আমাদের কেমিস্ট্রির প্রধান ল্যাবরেটরি আমাদের বাড়িতে এটিই কি ক্যান্সারের আঁতুড় ঘর ? যে রোগটা আমাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে- সেই ক্যান্সার- তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে রান্না ঘরেই কি লুকিয়ে রয়েছে আমাদের মানব শরীরের মারন বীজ? সেটা নিয়েই আজকের আলোচনা।

১) পোড়া খাবার কি আসলেই ক্যান্সারের কারণ?

প্রত্যেক বছর শীতকাল এলেই আমার অতি প্রিয় খাবার বেগুন পোড়া খেতে মন ফসফস করে। বাজারে এখন বেশ বড় ফোলা ফোলা পেল্লাই সাইজের বেগুনের রমরমা। স্বাদ যাই হোক না কেন দেখে কিন্তু বেশ সুখ হয় চোখের ।

আমি ঐ বেগুন কিনে ধুয়ে আয়েশ করে তেল মাখাই ওর পেটে পিঠে। পেটটায় চার ফালা করে ভেতরে রসুন এবং টমেটো কুচি ঢুকিয়ে দিই । তারপর ওভেনের উপর উল্টে পাল্টে সুন্দর করে রোস্ট করে নিই । আমার মা অবশ্য উনুনের আঁচে সরাসরি বেগুন পোড়া করতেন। যাইহোক আমার এ পদ্ধতি তো যুগের দাবী। উনুন চাইলে পাব কোথায়? তারপর আয়েশ করে বাইরের কালো পুড়ে যাওয়া ছাল গুলো তুলে দিয়ে নুন লঙ্কা এবং পেঁয়াজ সহযোগে মাখতে মাখতেই জিভ জলে ভরে উঠে। খেতে তো অমৃত লাগে। তবে বেগুন পোড়ার যা স্বাদ বেগুন ভাতের স্বাদ ততটা নয়। কেমন জলো জলো পানসে। বেগুন পোড়ার স্বাদ অধিকতর মিষ্টি। আর গন্ধ! সে তো মন কেমন করা! আমার মত অনেকেরই শীতকালের এটা বেশ উপদেয় খাবার।

আমার ছোটবেলায় শীতকালে মাঠে নাড়া পোড়াতাম। (এখন যদিও এই কাজটি অনৈতিক এবং পরিবেশ বান্ধব তো আদৌ নয় । বরং দূষণ সৃষ্টি কারক)। বাগান থেকে আলু জোগাড় করে ঐ নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার মজার স্মৃতি আজও নিশ্চিত অনেকের মনে অমলিন হয়ে আছে। আমার মত অনেকেরই বিহ্বল হয়ে আছেন নিশ্চিত - আলু পুড়িয়ে খাওয়া- বেগুন পুড়িয়ে খাওয়া- টমেটো পুড়িয়ে খাওয়া!

আজকাল আমরা এরকম ভাবে সরাসরি আগুনে পুড়িয়ে রোস্ট করে খাই অনেক কিছুই । এই স্বভাব দীর্ঘদিন ধরেই চলেছে গ্রাম থেকে শহর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

কিন্তু এই খাদ্যাভ্যাস বর্তমানে এক বিরাট প্রশ্নের চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে- আধুনিক সমাজ এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে।

বেগুন পুড়িয়ে খাবার সময় - ছাড়ানোর সময় তার মধ্যে কি বিন্দুমাত্র কালো পোড়া অংশ থেকে গেল না? অথবা আলু পোড়ার ছাল যখন আমরা ফেলে দিচ্ছি- তখনও কি কিছু কালো অংশ থেকে গেল? টমেটো রোস্ট করে খাবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই কালো কালো পোড়া অংশ টমেটোর সঙ্গে

মিশে থাকে । সেগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে সুখকর নয়। এগুলি ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। তাহলে কি এগুলো খাব না? বা খেলে কিভাবে খাব সেটা নিয়েই আলোচনা।

টোস্ট পুড়ে গেলে কি আপনি পুড়ে যাওয়া অংশ ছুরি বা চামচ দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলেন কালো পোড়া অংশগুলো? ছেঁচে ফেলে দেন? সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হচ্ছে এটাই ভালো বুদ্ধি।

ভাতের হাঁড়ির তলায় ভাত রান্না করতে গিয়ে যদি ভাত ধরে যায় কিম্বা পুড়ে যায় - হলুদ হয়ে যায় এবং পুড়ে কালো হয়ে যায় তখন কি আপনি ওই পোড়া ভাতকে ব্যবহার করেন খাওয়ার জন্য? তাহলে কিন্তু বিপদ ওত পেতে আছে। সম্ভবত সাক্ষাৎ ক্যান্সার।

আমরা প্রায়ই বেগুন ভাজতে গিয়ে বেগুনের ছালকে কালো করে ভাজি এবং বেগুনের শাঁস ও কালো করে ভাজি। পটল ভাজতে গিয়েও অধিকাংশ জায়গায় কালো কালো ছোপ ক'রে অধিক স্বাদের করে তুলি।

আলু ভাজবার সময় মচমচে করে ভাজতে গিয়ে অনেক আলু যেগুলো খুব পাতলা ভাবে কাটা হয়েছে সেগুলো বাদামি এবং কালচে হয়ে যায় । কিছুটা পুড়ে ও যায়। সেগুলো আমরা দারুণ সুস্বাদু বলে প্রথমে টপাটপ গিলে ফেলি। আসলে তখন আমরা শুধু আলুভাজা গিলছি তা কিন্তু নয় । সাক্ষাৎ ক্যান্সার কে গিলছি।

বাড়িতে রান্নার সময় মশলা কষার সময় অনেকক্ষণ ধরে আদা রসুন পেঁয়াজ মসলা বেশিক্ষণ কষলে ওগুলো পুড়ে কালো হয়ে যায় । তেতো স্বাদের হয় । সেগুলো ক্যান্সারের কারণ। আবার তরকারি রান্না করবার সময় খুন্তির ডগায় যে কালো কালো জিনিস শক্ত ভাবে সেঁটে থাকে তেল মশলার সঙ্গে সেটাও ক্যান্সারের কারণ।

কড়াই থেকে তরকারি ছেঁচে নেওয়ার সময় কড়াই এর ধারে শক্ত হয়ে লেগে থাকে যে তরকারি-সেগুলো দীর্ঘক্ষন তাপে থেকে থেকে ক্যান্সারের কারণ হয়ে ওঠে। হয়তো আমাদের এখন খাওয়া-দাওয়া ও রান্নাবান্নার এমন কিছু অভ্যাস রয়েছে যা আমরা অল্পবয়সে প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে শিখেছিলাম, সে সময় হয়তো বুঝতেও পারিনি - সেগুলো ভেবে থাকলে আমরা শারীরিক দিক থেকে একটু সুস্থ থাকবো।

যেমন ছুরি থেকে খাবার না খাওয়া, ভাঙা কাপ-পিরিচে না খাওয়া ইত্যাদি । কয়েক দশক আগে দাদু ঠাম্মা আমলে বা তাদের বাবা-মায়ের আমলে হয়তো অনেক কিছুই তারা করতেন যার বেশিরভাগই কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা অজান্তেই তারা হয়তো বিজ্ঞের মতো কিছু বলতেন বা কার্যকলাপ করতেন-সেরকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখনও হয়নি।

আধুনিক তথ্য নতুন আবিষ্কার :-

জায়গাটা স্টকহোম ইউনিভার্সিটি। সময়টা দু হাজার দুই সাল। ইউনিভার্সিটি অব স্টকহোমের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় দেখেন যে- পাউরুটির পোড়া অংশ ছেঁচে ফেলা দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করলেন যেকোনো খাবারদাবার যদি ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (২৪৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় ভাজা হয় বা রান্না হয় তাহলে অ্যাক্রিলামাইড তৈরি হয়।

যেমন আলু, পাউরুটি, বিস্কুট, সিরিয়াল, কফির মতো খাবারগুলো। এগুলোর চিনির উপাদান যথেষ্ট বেশি থাকে। অতিরিক্ত তাপে চিনি পুড়তে থাকে এবং কালো হতে থাকে। কালো হয়ে যাওয়াকে বলে ইংরেজিতে কোল। আর উচ্চতাপে পুড়ে যাওয়াকে ইংরেজিতে বলে চার । অর্থাৎ উচ্চ তাপে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া - কয়লা হয়ে যাওয়াকে চারকোল বলে।

প্রায় প্রত্যেকটি খাবারের মধ্যে প্রোটিন থাকে । আর প্রোটিন এর মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো এসিড কুড়ি রকমের। এর মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড হল অ্যাসপারজিন। এই উচ্চতাপে চিনির সঙ্গে অ্যাসপার জিনের চলে নিরন্তর বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার ফসল হল এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক এক্রিলামাইড। এই এক্রিলামাইড বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে অতি শক্তিশালী ক্যান্সার কারক।

এই প্রক্রিয়াটিকে 'মেইলার্ড প্রতিক্রিয়া' বলা হয় । , এটা এক ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। এই রাসায়নিক বস্তুটি খাবারের রংকে বাদামী থেকে কালো রঙ এ রূপান্তরিত করে । আর ওই রঙ দেখেই আমরা আকৃষ্ট হই । ওর বিশেষ এক ধরনের স্বাদ সৃষ্টিও করে । আমাদের জিভে জল আনে। স্বতন্ত্র এক স্বাদ দেয়। আর এর ফাঁদেই আমরা জড়িয়ে পড়ছি দিনরাত ।আমাদের শরীরে বাসা বাঁধছে মরণ রোগ।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে অ্যাক্রিলামাইডের একটি বিশেষ ডোজ প্রাণীদের মধ্যে কার্সিনোজেনিক অর্থাৎ ক্যান্সারের কারণ হয়ে ওঠে । নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে তবেই বিপদ । গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রাণী ব্যবহার করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে । মানুষের ব্যাপারে ও নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে শুধুমাত্র যদি এর পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকে তাহলে হয়তো ততটা ভাববার বিষয় নয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা যে পরিমাণ খাদ্য খাবার গিলে চলেছি তাতে নিশ্চিতভাবে বিপদ সীমাকে অতিক্রম করে গেছে প্রত্যেকের শরীরে। আর আধুনিক জীবনধারন পদ্ধতি , খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি , খাদ্য নির্বাচন সর্বোপরি লাইফ স্টাইল এটিকে ত্বরান্বিত করছে অনেকগুন। পশুদের ওপর গবেষণা থেকে আরও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে অ্যাক্রিলামাইডের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

এখন কি কি ক্ষতি করতে পারে? এই ক্ষতির তালিকায় সর্বপ্রথম আসবে নিউরো ডিজেনারেটিভ অর্থাৎ এটি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকোষ কে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে । অবশ করে দেয় । আমাদের স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। মগজকে ঝাঁজরা করে দেয়। বিভিন্ন জিনিসকে ভুলিয়ে দেয়। এটি ডিমেনশিয়ার মতো নিউরোডিজেনেরেটিভ রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং শিশুদের নিউরোডেভেলপমেন্টাল অসুখের পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে- বলছেন সুইডেনের ক্যারোলিনস্ক ইনিস্টিটিউটের ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক ফেদেরিকা লাগুজি।

"অ্যাক্রিলামাইড প্ল্যাসেন্টা সহ সমস্ত টিস্যুর মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কারণ এটার আণবিক ভর কম এবং জলে দ্রবণীয়" বলেছেন ফেদেরিকা লাগুজি, যিনি গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ পরিমাণে অ্যাক্রিলামাইড গ্রহণ এবং নবজাতক শিশুদের কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া, মাথার পরিধি এবং দৈর্ঘ্য কম থাকার মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। গর্ভবতী মা যদি প্রচুর পরিমাণ এই ধরনের পোড়া কালো খাবার খেতে থাকেন তাহলে ওই কেমিক্যালটি মায়ের প্লাসেন্টার ভেতর দিয়ে শিশুর শরীরে প্রবেশ

করে। শিশুটি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে। শিশুটি কম বোধ বুদ্ধি নিয়ে জন্মাবে। কিন্তু এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে কোন পদ্ধতিতে এই রাসায়নিক টি কাজ করে।

অ্যাক্রিলামাইডের সম্ভাব্য ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী প্রভাবের পেছনের প্রক্রিয়াটির সাথে হরমোনের সম্পর্কও থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন স্কাউটেন। এর কারণ , ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সাথে কিছু হরমোনেরও সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে এন্ডোমেট্রিয়াল ও ওভারিয়ান ক্যান্সারের মতো নারীদের যৌনাঙ্গের ক্যান্সার।

অ্যাক্রিলামাইড এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনকে প্রভাবিত করতে পারে যা নারীদের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এখনও এটা প্রমাণ হয়নি- বলেন স্কাউটেন।

অ্যাক্রিলামাইড যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেড়েছে। এটা অনেক দীর্ঘ পথ। অনেক সময় হয়তো লাগবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে।

কিন্তু অ্যাক্রিলামাইড গ্রহণ যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এ বিষয়ে হয়তো খুব শীগগিরই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে ।

আর এর মধ্যে পোড়া খাবার যেমন টোস্ট, বা পোড়া আলু এগুলো থেকে পোড়া অংশ ছেঁচে খাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই রোস্ট বা কাবাব থেকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর যদি আমরা খাইও তাহলে উচ্চতাপে ভাজাভুজি চলবে না । কোন খাবারের অংশ পুড়ে গেলে সেটাকে তৎক্ষণাতে বাদ দিতে হবে । কোনভাবেই ওরা কালো অংশ খাওয়া যাবে না। টমেটো অথবা বেগুন পুড়িয়ে খাওয়ার সময় নিশ্চিত হতে হবে ১০০ ভাগ কোন পোড়া কালো অংশ খাবারের মধ্যে চলে যাচ্ছে না তো ?তাহলেই বিপদ ! তরকারির মশলা কষতে গেলে যদি কোন মশলা পুড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে পরিত্যাগ করতে হবে। বাঁচার রাস্তা নিশ্চিত আছে । কিন্তু আমরা সেটা গ্রহণ করছি তো ? খাচ্ছি তো। ভাবছি কি?

ক্যানসার এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। বিশ্বে দ্রুত হারে বাড়ছে কর্কট রোগ। যে রোগের কথা শুনলে অনেকেই ভয় পান। কয়েকটি উপায় মানলেই এই রোগের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্তি মেলে। সেজন্য নিজেকে সতর্ক হতে হবে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রই হয়ে উঠতে পারে ক্যানসারের বাহক। রান্নাঘরের এই সব জিনিস থাকলে তাই এখনই সরিয়ে ফেলুন।

কম বয়সেই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। দুবার মারণ রোগকে হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা আর হয়নি। রবিবার দুপুর ১২টা ৫৯ মিনিটে থামেন অভিনেত্রী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ক্যানসার আক্রান্ত হয়েছিলেন। কেমোর পর সুস্থ হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল তাঁর অভিনয়জীবন।

ক্যানসার এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। বিশ্বে দ্রুত হারে বাড়ছে কর্কট রোগ। যে রোগের কথা শুনলে অনেকেই ভয় পান। কয়েকটি উপায় মানলেই এই রোগের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্তি মেলে। সেজন্য নিজেকে সতর্ক হতে হবে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রই হয়ে উঠতে পারে ক্যানসারের বাহক। রান্নাঘরের এই সব জিনিস থাকলে তাই এখনই সরিয়ে ফেলুন।

২) পুরনো মশলা-

পুরনো মশলা ঘরে রাখবেন না। অনেকেই ২-৩ মাসের মশলা কিনে রেখে দেন। এটা করবেন না।

বন্দেমাতরম্

✲ দেশপ্রেম

✲ সংঘবদ্ধ জীবন

✲ শিক্ষার প্রগতি

পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে

স্মৃতি

দেখতে দেখতে কেটে যাবে,
এই ছয়টি মাস।
স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে,
আমার সকল কাজ
আসবে কত নতুন বন্ধু
নতুন নতুন আসা
ছোটো ছোটো আসা গুলোর
থাকেনা কোনো ভাষা
আমার প্রতি তোমাদের
এতো ভালোবাসা —
থেকে যাবে চিরকাল এই মনে গাঁথা

প্রিয়,

সবুজ,

প্রথমেই ছাত্র সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'পরিচয় পত্র' বিভাগের পক্ষ থেকে ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের সকল নবাগত ভাই - বোন নবীন প্রবীন সকল দাদা - দিদি ও আমার সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের একরাশ ভালোবাসা ও প্রনাম।

যেদিন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম পা রাখছিলাম সেদিন অনুভব করলাম আমার সোনালি কৈশোরে ইতি টানলাম। স্কুল জীবনের গন্ডিপেরিয়ে কলেজের গন্ডি, এ যেন বড়ো হয়ে যাওয়া।

স্কুল লাইফ শেষ, আর কলেজ লাইফ শুরু

কিছু বন্ধুন্ধের সমাপ্ত আর কিছু বন্ধুত্বের সূচনা

আমার জীবনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সময় হল কলেজ জীবন। কারণ কলেজের শিক্ষা মানুষকে সারাজীবন পদপ্রদর্শন হিসেবে কাজ করে। কারণ, কলেজে মানুষ শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে তা নয় বরং জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের উপযুক্ত সময়।

আমার কলেজের প্রথম দিনের কথা খুব মনে পড়ে। কারণ খুবই অপরিচিত এবং সব অচেনা মুখ, প্রথম প্রথম প্রতিদিন খুব একা লাগত। কিন্তু হঠাৎ দেখি কয়েকজন দাদা, দিদিরা আমাদের কাছে এসে আমাদের সাথে কথা বলত, মজা করত, কলেজের সমস্ত রকম খবর জানিয়ে দিন। আমাদের সুবিধা, অসুবিধা কথা জিজ্ঞেস করে তার সমাধান করে দিন, এর মধ্যেই যেন ছাত্র সংসদের সবুজ ঘরটাকে ভালোবেসে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি। ওই ভালোবাসার টানে আমিও ছাত্র পরিবারের এক সদস্য হয়ে গেলাম।

এর মধ্যেই রাজ কলেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ "পরিচয় পত্র" অর্থ্যাৎ Identy Card -এর দায়িত্ব দেওয়া হল আমার ওপর। I Card বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কলেজ জীবনে প্রত্যেকেরই I Card ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কলেজ জীবনে প্রথম যে জিনিসটা দরকার সেটি হল "পরিচয় পত্র" I Card কলেজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন বাসে Student Concession ভাড়া, কলেজে

করে। শিশুটি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে। শিশুটি কম বোধ বুদ্ধি নিয়ে জন্মাবে। কিন্তু এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে কোন পদ্ধতিতে এই রাসায়নিক টি কাজ করে।

অ্যাক্রিলামাইডের সম্ভাব্য ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী প্রভাবের পেছনের প্রক্রিয়াটির সাথে হরমোনের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন স্কাউটেন। এর কারণ , ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সাথে কিছু হরমোনের সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে এন্ডোমেট্রিয়াল ও ওভারিয়ান ক্যান্সারের মতো নারীদের যৌনাঙ্গের ক্যান্সার।

অ্যাক্রিলামাইড এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনকে প্রভাবিত করতে পারে যা নারীদের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এখনও এটা প্রমাণ হয়নি- বলেন স্কাউটেন।

অ্যাক্রিলামাইড যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেড়েছে। এটা অনেক দীর্ঘ পথ। অনেক সময় হয়তো লাগবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে।

কিন্তু অ্যাক্রিলামাইড গ্রহণ যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এ বিষয়ে হয়তো খুব শীগগিরই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে ।

আর এর মধ্যে পোড়া খাবার যেমন টোস্ট, বা পোড়া আলু এগুলো থেকে পোড়া অংশ ছেঁটে খাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই রোস্ট বা কাবাব থেকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর যদি আমরা খাইও তাহলে উচ্চতাপে ভাজাভুজি চলবে না । কোন খাবারের অংশ পুড়ে গেলে সেটাকে তৎক্ষণাতে বাদ দিতে হবে । কোনভাবেই ওরা কালো অংশ খাওয়া যাবে না। টমেটো অথবা বেগুন পুড়িয়ে খাওয়ার সময় নিশ্চিত হতে হবে ১০০ ভাগ কোন পোড়া কালো অংশ খাবারের মধ্যে চলে যাচ্ছে না তো ?তাহলেই বিপদ ! তরকারির মশলা করতে গেলে যদি কোন মশলা পুড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটিকে পরিত্যাগ করতে হবে। বাঁচার রাস্তা নিশ্চিত আছে । কিন্তু আমরা সেটা গ্রহণ করছি তো ? খাচ্ছি তো। ভাবছি কি?

ক্যানসার এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। বিশ্বে দ্রুত হারে বাড়ছে কর্কট রোগ। যে রোগের কথা শুনলে অনেকেই ভয় পান। কয়েকটি উপায় মানলেই এই রোগের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্তি মেলে। সেজন্য নিজেকে সতর্ক হতে হবে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রই হয়ে উঠতে পারে ক্যানসারের বাহক। রান্নাঘরের এই সব জিনিস থাকলে তাই এখনই সরিয়ে ফেলুন।

কম বয়সেই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। দুবার মারণ রোগকে হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা আর হয়নি। রবিবার দুপুর ১২টা ৫৯ মিনিটে থামেন অভিনেত্রী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ক্যানসার আক্রান্ত হয়েছিলেন। কেমোর পর সুস্থ হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল তাঁর অভিনয়জীবন।

ক্যানসার এখন ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে। বিশ্বে দ্রুত হারে বাড়ছে কর্কট রোগ। যে রোগের কথা শুনলে অনেকেই ভয় পান। কয়েকটি উপায় মানলেই এই রোগের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্তি মেলে। সেজন্য নিজেকে সতর্ক হতে হবে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রই হয়ে উঠতে পারে ক্যানসারের বাহক। রান্নাঘরের এই সব জিনিস থাকলে তাই এখনই সরিয়ে ফেলুন।

২) পুরনো মশলা-

পুরনো মশলা ঘরে রাখবেন না। অনেকেই ২-৩ মাসের মশলা কিনে রেখে দেন। এটা করবেন না।

পুরনো মশলা ব্যবহার করবেন না। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে মশলা নষ্ট হয়ে যায়। অথবা বাড়িতে থাকলে তাতে জল-বাতাস লেগে নানা ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাশের আক্রমণ ঘটে। ওই ছত্রাক ক্যান্সারের কারণ। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। সেই সঙ্গে মশলার গুণমান দেখে কেনা উচিত। এমন অনেক মশলা রয়েছে যা তরিতরকারিতে ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি হয়। তাই মশালা খোলা কেনার পরিবর্তে ভাল কোম্পানির কিনুন। সেই সঙ্গে তরকারিতে কম মশলা ব্যবহার করুন। কোন মশলা দু মাসের বেশি ব্যবহার করবেন না । তাই মশলার ছোট পাউচ কিনতে হবে। পারলে বিভিন্ন মশলা গোটা কিনে বাড়িতে গুঁড়ো করে ব্যবহার করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে মিক্সচার গ্রাইন্ডার আছে । মিকচার grinder এ প্রত্যেকটা মশলাকে একটু ভেজে গুঁড়ো করে নিতেই পারি । অন্তত প্রত্যেক মাসের মশলা একটা দিন নির্দিষ্ট সময় বের করে আমাদের তৈরি করে নিতে হবে।অনেকে ভাববেন এতে তো ভারি হ্যাপা । এতকিছু করা যায় । আবার বলি হ্যাঁ বাঁচতে গেলে তো করতেই হবে। হলুদে তো ভয়ঙ্কর ভাবে মেটানিল ইয়েলো মেশানো থাকছে । খাবারের সময় এখনকার হলুদ অর্থাৎ তরকারির ঝোল জামা কাপড়ে পড়লে ভয়ঙ্কর ভাবে স্টেইন ধরে। মেটানিল ইয়েলো, ওটি সাক্ষাৎ যম বা ক্যান্সারের কারণ। একইভাবে লঙ্কার গুঁড়োতে তো যথেচ্ছ হবে মেশানো হচ্ছে রুডামাইন্ রেড । একবার যদি শরীরে ঢুকে তাহলে জেনে রাখুন আপনার ক্যান্সার নিশ্চিত। অথচ হলুদ এবং লঙ্কা ছাড়া আমরা চলতেই পারবো না । হলুদ এবং লঙ্কা যদি ক্যান্সারের কারণ হয় তাহলে আমরা কেন বাজার থেকে হলুদ এবং লঙ্কার গুঁড়ো কিনব ?

অতকিম কি পরামর্শ?

আপনারা একদিন গোটা হলুদ কিনে গোটা লঙ্কা কিনে বাড়িতে গুঁড়ো করে ফেলুন । বাঁচতে গেলে এটা করতে হবে।

৩) নন-স্টিক বাসন-

রাঁধতে আরাম। সময়ও লাগে কম। তাই এখন সব ঘরেই ননস্টিক বাসনের রমরমা। কিন্তু এই বাসনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মারণ রোগ ক্যান্সারের বিষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ননস্টিক বাসনে যে টেফলনের প্রলেপ থাকে তা থেকেই শরীরে বাসা বাঁধছে হাজারো রোগ।ননস্টিক কেন ক্ষতিকর?

ননস্টিক বাসনে থাকে টেফলন নামে এক ধরনের ক্ষতিকর পলিমারের আস্তরণ। বেশি আঁচে ওই পলিমার থেকে পনেরোটিরও বেশি ক্ষতিকারক গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই গ্যাস রান্না করা খাবার-দাবারে তো মেশেই, থাকে রান্নার করার সময় ধোঁয়াতেও। ক্ষতিকর এই পলিমার তৈরি হয় পারফ্লুরোকট্যানোইক অ্যাসিড SPFOAV ও PFCS, এই দুটি রাসায়নিক উপদান দিয়ে, যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

রোগের আশঙ্কা

টেফলন কোটিং থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস শরীরে গেলে ক্যান্সারের মত মারণ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি থাকে অকালে থাইরয়েডে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাতাসেও মেশে বিষ। যে বাড়িতে ননস্টিক কুকওয়্যারে রান্না হয়, সেই রান্নাঘরের কাছাকাছি পোষা পাখি থাকলে তারও

মৃত্যু হতে পারে। অত্যধিক আঁচে টেফলন থেকে রাসায়নিক গুলি খাবারে মিশতে থাকে। তাই মাঝারি
রান্না করুন কম আঁচে। অ্যালমুনিয়ামের বাসনের ওপরেই টেফলনের প্রলেপ দেওয়া হয়। খাদ্য বিশেষজ্ঞ
বলছেন, অ্যালমুনিয়াম শরীরের পক্ষে আরও বিপজ্জনক। কারণ অ্যালমুনিয়াম শরীরে মিশলে তৈরি
স্মৃতিহীনতা বা অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগ।

বর্তমানে রান্নাঘরে বেড়েছে নন-স্টিক বাসনের ব্যবহার। এই বাসনগুলি রাসায়নিক দিয়ে তৈরি
করা হয়। এ ধরনের রাসায়নিককে পারফ্লুওকটেন সালফেট বলা হয়। শ্যাম্পু, ওয়াটারপ্রুফ পোশাক
প্রসাধনী, পরিষ্কার করার পণ্যে যা ব্যবহার করা হয়। রোজের রান্না নন-স্টিকে করলে ক্যানসারের ঝুঁকি
বাড়ে।

কম তেলে রান্নার ক্ষেত্রে এখন অনেকের ভরসা নন-স্টিক পাত্র। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণা
সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ক্যান্সারের মতো মরণ রোগের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে এসব পাত্রে রান্না করা
খাবার। মার্কিন স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা 'জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'-এ
প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, নন-স্টিক বাসনপত্র তৈরি হয় 'পারফ্লুওরোয়ালকাইল কম্পাউন্ড
(পিএফসি)' নামের এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান দিয়ে। এই উপাদানটিকেই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর
হওয়ার জন্য দায়ী করেছেন একদল ইতালীয় গবেষক। এরই মধ্যে উপাদানটিকে 'কার্সিনোজেনিক' বলে
চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা 'দ্য এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি' (ইপিএ)।
এটি ক্যান্সারের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই দায়ী। মার্কিন গবেষকদের
দাবি, রাসায়নিক উপাদানটি শুধু ক্যান্সারই নয়, থাইরয়েড বা বন্ধ্যাত্বের মতো একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার
জন্য দায়ী। ইতালির একটি হাই স্কুলের ৩৮৩ জন ছাত্রের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ২১২ জনের রক্তে
পিএফসির অস্তিত্ব মিলেছে। এর ফলে ২১২ জনের যৌনাঙ্গের আকৃতি বদলে গেছে। প্রভাবিত হয়েছে
তাঁদের প্রজনন ক্ষমতাও।

তাহলে কি করব?

এ সব রোগের ঝুঁকি এড়াতে স্টেনলেস স্টিল, লোহা বা সিরামিকের বাসনে রান্নার পরামর্শই রইল
। পুরনো অভ্যাসেই ফিরে গিয়ে কম তেলে রান্নার পরামর্শ দিলাম ।

৪) টি-ব্যাগ -

যুগ বদলেছে। চা পাতা ফোটানোর পরিবর্তে এসেছে টি ব্যাগ। অনেকেই সকালে টি-ব্যাগ দিয়ে চা
খেতে পছন্দ করেন। অফিসেও টি ব্যাগ ডুবিয়ে চা খান। এটাও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এতে
রয়েছে পিসিভি, ফুড গ্রেড নাইলন, ন্যানো প্লাস্টিক। এই টি ব্যাগগুলি গরম জলে ডোবানো মাত্রই
তিনটি যৌগ ভেঙে জলের সঙ্গে মিশে যায়। তার ফলে কার্সিনোজেন নামে একটি উপাদান চায়ে মেশে।
বাড়ে ক্যানসারের সম্ভাবনা।

চা খান না এমন মানুষ খুব কম আছেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার
আগে পর্যন্ত অগুনতি বার চা খাওয়া কিন্তু হয়েই থাকে। সুগন্ধি চা পাতা হোক কিংবা রং হবে এমন চা
পাতা চা কিন্তু অনেক সমস্যার মুশকিল আসান। আবার এই চায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেককিছুই কিন্তু

আপনার বিরাট ক্ষতি করতে পারে।

যুগ এগিয়েছে, এখন চায়ের কৌটো কিংবা প্যাকেটের থেকেও বেশি বেড়েছে টি ব্যগস এর ব্যবহার। এটি সহজে যেমন ব্যবহার করা যায়। তেমনই যেখানে সেখানে নিয়েও যাওয়া যায়। চা বানাতে প্রয়োজন শুধু একটু গরম জল। কিন্তু এই টি ব্যাগস শরীরের পক্ষে বেজায় খারাপ। এর থেকে হতে পারে মারণ রোগ ক্যান্সারও। McGill বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রে জানানো হয়েছে একটি প্লাস্টিকের টি ব্যাগ নানা ধরনের ক্ষতিকর জিনিস ছড়িয়ে দিতে পারে চায়ের কাপে। সেগুলি কী কী?

১১.৬ বিলিয়ন মাইক্রপ্লাস্টিক, ৩.১ বিলিয়ন ন্যানো প্লাস্টিকস। এগুলি শরীরের পক্ষে এবং বিশেষ করে শারীরিক কোষের পক্ষে বেজায় খারাপ। ব্যাগ থেকে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে নাইলন এর মত ক্ষতিকর পদার্থ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি পেপার টি ব্যাগে এপিক্লোরহাইডিন নামক কেমিক্যাল থাকে যেটি থেকে পোটেনশিয়াল কারসিনোজেন নিঃসৃত হয়। এটি কিন্তু ক্যান্সারের মত ব্যাধির জন্ম দিতে পারে। প্রথম কথা টি ব্যাগ একেবারেই ভেঙে যায় না। দ্বিতীয় এটি এতটাই হালকা পাতলা হয় যে সহজেই দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে দিতে পারে।

টি ব্যাগ নিয়ে সাবধান হওয়ার সময় সমাগত। সাধারণ দর্শন টি হল সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদরা বলছেন, উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকের টি ব্যাগ থেকে নির্গত হতে থাকে ওইসমস্ত ক্ষতিকর উপাদান। নাইলনের টি ব্যাগগুলি পলিপ্রোপোলিনের সবচাইতে বৃহৎ উৎস। এমনকী কাগজের তৈরি টি ব্যাগগুলিতেও একটি বিশেষ ধরনের উপাদানের প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই রাসায়নিকটির নাম এপিক্লোরোহাইড্রিন। কাগজের টি ব্যাগের আকার অটুট রাখতেই এই রাসায়নিকের প্রলেপ দেওয়া হয়। উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এপিক্লোরোহাইড্রিন জলে মিশে যায়। এপিক্লোরোহাইড্রিন কার্সিনোজেনিক বা ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম বলেই জানা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, রাসায়নিকটি এতটাই ক্ষতিকারক যে শরীরে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ভারসাম্যেও ব্যাঘাত ঘটাতে সক্ষম। আমাদের মনে রাখতে হবে, হরমোনের গণ্ডগোলে দেখা দিতে পারে একাধিক অসুখ যেমন ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা। বিশেষ করে মহিলাদের শরীরের হরমোনের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটলে হতে পারে পিসিওডি, আগাম মেনোপজ, এমনকী বন্ধ্যাত্বও! এন্ডোমেট্রিয়াসিসের সমস্যা থাকলে তা আরও খারাপ আকার নিতে পারে হরমোনের ভারসাম্যজনিত গণ্ডগোলে।

শুধু এপিক্লোরোহাইড্রিনই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডায়োক্সিনের প্রলেপও দেওয়া হয় টি ব্যাগে। উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলি জলে মিশে যায়। ওই পানীয় পান করলে রাসায়নিকরগুলি মানবদেহে প্রবেশ করে এবং বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। উপাদানগুলি ভয়ঙ্কররকম বিষাক্ত। এমনকী ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ায়। ব্যাগের ব্যবহার ভালোর চাইতে কিন্তু খারাপই করছে বেশি। কীভাবে? মন্ট্রিয়ালের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গবেষক দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একটি প্লাস্টিকের টি ব্যাগ থেকে চায়ের কাপে অসংখ্য ক্ষতিকর দ্রব্য মিশে যেতে পারে। এমনকী একটি ৫ মিলিমিটারের কম আকারের প্লাস্টিক টি ব্যাগ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে চায়ের কাপে মিশে যেতে পারে অতি ক্ষুদ্রাকার ১১.৫ বিলিয়ন ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং ৩.১ মিলিয়ন ন্যানোপ্লাস্টিক। বুঝতেই

পারছেন বিষয়টা কতখানি গুরুতর। টক্সিন শরীরে বেশি মাত্রায় গেলে বেজায় বিপদ। সত্যিই ভয়ঙ্কর। তাই এরপর থেকে শুধুই চায়ের পাতা কিংবা পাউডারের ব্যবহার করা ভাল। টি ব্যাগের মধ্যে দিওএক্সিন এবং এপিক্লোরহাইডিনের এক আস্তরণ থাকে। সেটি জলের সংস্পর্শে যেতেই বিক্রিয়া শুরু করে।

কি করব?

তবে একেবারে পাতলা কাপড়ের টি ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু প্লাস্টিক অথবা ক্রেপ কাপড়ের একেবারেই না। সবথেকে ভাল যদি এর ব্যবহার না করা যায়।

৫) প্লাস্টিকের লাঞ্চবক্স ও বাসনপত্র-

বেঁচে যাওয়া খাবার প্লাস্টিকের বাক্সে রাখেন? এর ফলে শরীরের কী ক্ষতি হয় জানেন? আপনাদের সন্তানকে প্রত্যেকদিন যে টিফিন দিচ্ছেন সেটা কি প্লাস্টিকের বাক্সে ভরে দিচ্ছেন? অথবা গরম গরম হালুয়া অথবা রুটি প্লাস্টিকের বাক্সে ভরে টিফিন তৈরি করে কর্তাকে অফিস পাঠাচ্ছেন? দয়া করে করবেন না।

শপথ করুন আগামীকাল থেকে আর কোন দিন এ কাজ করবেন না। এটি সাক্ষাৎ যম ক্যান্সার।

বিদ্যুতের বিলে রাশ টানতে প্লাস্টিকের বাক্সে খাবার ভরে, ফ্রিজে রাখেন বেশির ভাগ মানুষ। মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বাক্স হলে, ফ্রিজ থেকে বার করা খাবার গরম করতেও সুবিধা হয়।গরম রান্না অনেকে প্লাস্টিকের বাটিতে রাখেন। বহু রেস্তরাঁতেও দেওয়া হয় প্লাস্টিকের বাটি। সকালে অফিসে দেওয়া হয় প্লাস্টিকের টিফিনবক্স। প্লাস্টিককে শক্ত করতে বিসফেনল নামক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। লাঞ্চবক্সে বা প্লাস্টিকের বাটিতে গরম তরিতরকারি দেওয়ার পর সেই রাসায়নিক দ্রবীভূত হয়ে যায়। শরীরে বাসা বাঁধে কর্কট রোগ। তাই কাঁচের টিফিন বক্স ও স্টিলের বাসনপাত্র ব্যবহার করুন।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। সকালে ঘুম চোখ খুলে যে ব্রাশটি মুখে দিয়ে দাঁত মাজতে হয়, তা-ও প্লাস্টিকের। সকালে শিশুর মুখের সামনে যে দুধের গ্লাসটি ধরেন, সেই দুধের প্যাকেটও প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি। স্বাস্থ্য সচেতন, তাই অফিসে রান্না করা বাড়ির খাবার নিয়ে যান। কিন্তু সেই খাবার নিয়ে যান প্লাস্টিকের টিফিন বক্সে। সেই খাবার খাওয়ার আগে তা আবার মাইক্রোওভেনে গরমও করে নেন। এ ছাড়া রান্না করা খাবার রাখার জন্যেও অনেকে প্লাস্টিকের বাক্স ব্যবহার করেন। অনেকে বলে ফ্রিজে ধাতুর, ভারী বাক্স ব্যবহার করলে নাকি বিদ্যুৎ পোড়ে বেশি। তাই মোটা অঙ্কের বিদ্যুতের বিলে রাশ টানতে প্লাস্টিকের বাক্সে খাবার রাখেন বেশির ভাগ মানুষ। মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বাক্স হলে, ফ্রিজ থেকে বার করা খাবার গরম করতেও সুবিধা হয়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে চলা এই অভ্যাস নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। কারণ, উদ্বৃত্ত খাবার প্লাস্টিকের বাক্সতে রেখে, তার পর তা আবার গরম করার প্রক্রিয়াটি স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভাল নয়। প্লাস্টিক গরম করলে তা থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক নির্গত হয়। যা খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরে প্রবেশ করলে, তা থেকে ক্যানসারের মতো জটিল রোগ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিকজাত বর্জ্য থেকে পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রাণীদেরও প্রাণসংশয় ঘটতে পারে।

বড় বড় চিকিৎসক থেকে বিজ্ঞানীদের মত, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে কাচের পাত্র বা বাক্স ব্যবহার

করাই ভাল। আর একান্ত বাইরে কোথাও গেলে যদি কাচের জিনিস নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়, সে ক্ষেত্রে যে সব টিফিন বাক্স 'পলিথিলিন টেট্রাথ্যালেট' বা 'পেট' বলে চিহ্নিত, সে গুলিই ব্যবহার করা যেতে পারে। ভুল করেও বাজার থেকে দেওয়া পাতলা সাদা রঙের অথবা কালো রঙের পাতলা প্লাস্টিকের বাক্স নেবেন না। তাতে গরম গরম কোন খাবার বিরিয়ানি আনবেন না। ওই কন্টেনারকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না। ভুলেও ওই কন্টেনারে কোন খাবার মাইক্রোওভেনে দেবেন না। একবার মাত্র ব্যবহার করবেন। যদি ভুলবশত ব্যবহার করাও হয় মাইক্রোওভেনে দেবেন না। এর ফলে বিভিন্ন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ গুলো খাবারের সঙ্গে মিশে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইক্রো প্লাস্টিক খাবারের সঙ্গে মিশছে এবং যার ফলস্বরূপ ক্যান্সার।

৬) জলের বোতল :-

ভোরবেলা আপনি সারি সারি ভরে রাখছেন। জলের বোতলে জল ভরে। আপনি অফিসে নিয়ে যাচ্ছেন। যে বোতলে জল খাচ্ছেন সেই আদৌ নিরাপদ তো? সেটি কি স্বাস্থ্যসম্মত ? সে নিয়ে কোন খোঁজ নিয়েছেন ?

প্রতিটা প্লাস্টিকের গায়েই একটি ত্রিভুজাকৃতি চিহ্ন থাকে। এটা আসলে রিসাইকেল অর্থাৎ পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার প্রতীক। অর্থাৎ আপনি রোজ যে বোতলে জল খাচ্ছেন, যে প্লাস্টিকের মধ্যে তাজা সব্জি ভরে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিচ্ছেন বা আরও কোনও দৈনন্দিন কাজে লাগাচ্ছেন সেটা কতটা নিরাপদ? বা আপনার জন্য আদৌ নিরাপদ কি না তা বোঝা যাবে এই প্রতীক থেকেই।

আপনার বয়ে বেড়ানো প্লাস্টিকের বোতলটি উল্টে পেছনে দেখুন তিন কোনো আকৃতির একটি চিহ্নের মধ্যে ১/২/৩/৪/৫/৬/৭ কোন একটি সংখ্যা লেখা আছে কিনা। যদি না লেখা থাকে ওই কন্টেনার দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না। কোল্ড্রিংসের কোন বোতল দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না। জলের বোতল ব্যবহার করার পর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না। কোন বোতলের পেছনে কি লেখা আছে? যদি হাত লেখা থাকে তবে নিরাপদ ১/২/৩/৪ এগুলো লেখা থাকলে আদৌ নিরাপদ নয়। তাহলে এখন করনীয় কি এখন করণীয় বলতে একটাই আজ থেকে শপথ করুন প্লাস্টিকের বোতল নয় অন্তত একটা স্টিলের বোতল নিয়ে রাস্তায় ঘাটে বেরোই।। এইরকম ধীরে ধীরে আমাদের অভ্যাসকে একটু একটু করে বদলাতে হবে অভ্যাসের গলায় লাগাম না পরাতে পারলে আগামী বিশ্ব ক্যান্সারে ভরে যাবে। যতটা সম্ভব প্রিজারভেটিভ দেওয়া কোন মশলাদার খাবার খাওয়া যাবেনা। প্রিজারভেটিভ আমাদের ক্যান্সার তৈরি করে শুধু তাই নয় ম্যাগি চাউমিনে আজিনা মোট সেও ক্যান্সার তৈরি করে তাই কোনভাবে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে এমন কোন জিনিস আমরা দূরে রাখবো।

৭) খাদ্য ও পানীয় সঞ্চয়ের জন্য প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার করুন:-

সবচেয়ে নিরাপদ উপকরণগুলির মধ্যে রয়েছে কাচ (উদাঃ পাইরেক্স), স্টেইনলেস স্টিল এবং সীসা-মুক্ত সিরামিক। এগুলো এমনকি নিরাপদ প্লাস্টিকের চেয়েও ভাল। সম্ভব হলে প্লাস্টিকের প্যাকেজিং ছাড়াই খাবার কিনুন এবং তাজা, অপ্রক্রিয়াজাত খাবার বেছে নিন। কম প্যাকেজিং সহ পুরো খাবারের জন্য কৃষকদের বাজারে কেনাকাটা শুরু হোক। প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্লাস্টিক থেকে

রাসায়নিক দূষিত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে।

রান্নাঘরে প্লাস্টিক বিশেষ যত্ন নিন:-

তাপ লিচিংকে ত্বরান্বিত করে। তাই সমস্ত প্লাস্টিকের মাইক্রোওয়েভ এড়িয়ে চলুন (এমনকি যদি 'মাইক্রোওয়েভ নিরাপদ' লেবেল করা হয়) এবং প্লাস্টিকের মধ্যে সংরক্ষণ করার আগে যেকোনো গরম খাবার ঠান্ডা করুন।

তাই টিফিন বাক্সে কোন কিছু রাখবার সময় - খাবারটিকে ঠান্ডা করবার পর তারপর প্লাস্টিকের টিফিন বাক্সে রাখুন। চর্বিযুক্ত বা অ্যাসিডিক খাবারগুলি সহজেই বিষাক্ত ক্যান্সার তৈরিকারী রাসায়নিকগুলিকে শোষণ করে । তাই প্লাস্টিকের বাক্সে কোন তেল বা ফ্যাট জাতীয় গরম জিনিস রাখবেন না। সেগুলিকে প্লাস্টিকের মধ্যে সংরক্ষণ করা এড়িয়ে চলুন।

আপনি যখন প্লাস্টিক ব্যবহার করেন, তখন এই কোডগুলি খোঁজ করুন। এদের মধ্যে নিরাপদ কোডগুলি কে বেছে নেবেন

এগুলো হলো: 2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP।

২ HDPE (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন) উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: বোতলজাত দুধ, জল এবং জুস, দইয়ের কাপ এবং কিছু প্লাস্টিকের ব্যাগ।

৪ LDPE (লো ঘনত্বের পলিথিন): রুটির জন্য ব্যাগ, হিমায়িত খাবার এবং তাজা পণ্য, পিভিসি-মুক্ত ভোক্তা ক্লিং র্যাপ, পুনরায় সিলযোগ্য জিপার ব্যাগ এবং কিছু বোতল।

৫ পিপি (পলিপ্রোপিলিন) এর উদাহরণ: খাদ্য সংরক্ষণের পাত্র, ডেলি স্যুপ, দইয়ের পাত্র এবং শিশুর বোতল সহ অন্যান্য মেঘাচ্ছন্ন প্লাস্টিকের পাত্র।

৮) পিভিসি-মুক্ত হবার চেষ্টা করুন:-

পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড, ৩), যাকে সাধারণত ভিনাইল বলা হয়, একটি নরম, নমনীয় প্লাস্টিক যা নির্মাণ সামগ্রী এবং ঝরনা পর্দা, খেলনা এবং প্যাকেজিংয়ের মতো ভোক্তা পণ্যগুলিতে পাওয়া যায়। PVC-তে সাধারণত phthalatesé-এর মতো বিপজ্জনক অ্যাডিটিভ থাকে এবং সারা জীবন জুড়ে বিপজ্জনক রাসায়নিক মুক্ত করে। আপনি কার্যত সব ক্ষেত্রে PVC এর নিরাপদ বিকল্প খুঁজে পেতে পারেন।

৯) বিসফেনল-এ SBPAV এড়াতে পলিকার্বোনেট SPC 7V থেকে দূরে থাকুন:-

পলিকার্বোনেট হল একটি পরিষ্কার শক্ত প্লাস্টিক যা কিছু পুনঃব্যবহারযোগ্য জলের বোতল, শিশুর বোতল, বাণিজ্যিক জলের জগ এবং রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি যেমন স্বয়ংক্রিয় কফি মেকার এবং ফুড প্রসেসরগুলিতে ব্যবহৃত হয়। পরিবর্তে, পানীয় পাত্রের জন্য কাচ বা আনলাইনযুক্ত স্টেইনলেস স্টিল বেছে নিন। খাবারের জায়গায় প্লাস্টিক নেই এমন সরঞ্জামগুলি সন্ধান করুন, যেমন ফ্রেঞ্চ প্রেস কফি মেকার, স্টেইনলেস স্টিলের স্টিক ব্লেন্ডার বা কাচের বয়ামের ব্লেন্ডার।

১০) ৪২পলিস্টাইরিন থেকে তৈরি পণ্য এড়িয়ে চলুন SPS 6V।

স্টাইরোফোম ফুড ট্রে, ডিসপোজেবল কাপ এবং বাটি, ক্যারি-আউট পাত্রে এবং অস্বচ্ছ প্লাস্টিকের

কাটলারিতে পাওয়া যায়, পলিস্টাইরিন স্টাইরিন, একটি নিউরোটক্সিন এবং সম্ভাব্য কার্সিনোজেন লিচ করতে পারে।

১১) সম্ভব হলে প্লাস্টিক-মুক্ত খেলনা বেছে নিন, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের জন্য যারা প্রায়ই তাদের মুখে রাখে। রং না করা কাঠের তৈরি খেলনা, কাপড়ের পুতুল, খেলনা এবং কাগজের তৈরি গেম বা গাজল দেখুন। প্লাস্টিকের দাঁতের পরিবর্তে হিমায়িত ওয়াশক্লথ অফার করুন। খেলনা হিসাবে সেল ফোন বা রিমোট কন্ট্রোলের মতো প্লাস্টিকের ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করবেন না, কারণ এতে শিখা প্রতিরোধকের মতো ক্ষতিকারক সংযোজন থাকতে পারে।

১২) পুনর্ব্যবহার করার আগে হ্রাস করুন : বোতলজাত জল, প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ এবং অতিরিক্ত প্যাকেজিংয়ের মতো একক-ব্যবহারের, নিষ্পত্তিযোগ্য প্লাস্টিকের অভ্যাসকে বাদ দিয়ে দিন ।

বেশিরভাগ প্লাস্টিক আবর্জনার মধ্যে শেষ হয়, স্থলে দূষিত হয় এবং সমুদ্রে জমা হয়, এটি সমুদ্রের জীবনের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। যদিও আমরা প্লাস্টিককে সহজে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করি, ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য হার ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। প্লাস্টিক-মুক্ত জীবনযাত্রার নির্দেশিকা থেকে ধারনা নিয়ে আপনার প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে পদক্ষেপ নিন ।

১৩) প্রত্যেকদিন আমরা থালা-বাসন মাজছি বিভিন্ন রকম ডিটারজেন্ট লিকুইড সাবান দিয়ে। থালা-বাসন মাজার পর খালি চোখে দেখা যায় না ময়লা আছে কিনা ! কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন ওই থালার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পরিমান সাবানের কনা লেগে থাকছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই সাবানের অনু আমাদের শরীরে ঢুকতে ঢুকতে একসময় শরীরে ভিটারজেনের পাহাড় গড়ে ওঠে। আমরা মদ খেলে যে ক্যান্সার হবে সে কথা সত্যি নয়। মদ খেলে ধূমপান করলে ক্যান্সার হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকদিন আমাদের থালা-বাসনের মধ্যে যে লক্ষ সহস্র কোটি কোটি পরিমান সাবানের অনু সাইলেন্ট কিলার বা নীরব ঘাতক হিসেবে আমাদের মৃত্যুবান শানিয়ে রাখছে!

তাই জীবন তো একটাই। এ জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। একে আর সংক্ষিপ্ত করে কি লাভ?

বাদুড়গ্রাম ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মানিক দাস
স্যাক্ট অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

সালটা ২০২০, আমাদের স্যার শুভময় বাবুর কাছে খবর আসে নন্দীগ্রামের একটি গ্রামে কয়েকটা গাছে হাজার হাজার বাদুড় বসবাস করে।

সেই মতো গ্রামটির ডাকনাম হয় বাদুড় গ্রাম। এই সংবাদটি স্যারের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্যারের কাছের বন্ধু, আনন্দবাজার পত্রিকার একজন সাংবাদিক আরিফ ইকবাল খান। খোঁজ শুরু হয় গ্রামটি কোথায়, ভাবা হয় গ্রামটিতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে আসার। কিন্তু চারিদিকে তখন নতুন এক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, যা কিনা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। মানুষের ঘর থেকে বেরোনোর নিষেধ। মানুষেরা গৃহবন্দি। লকডাউন নামক নিয়মের বেড়াজলে বন্দি দেশ ও পৃথিবী।

লকডাউন চলাকালীন আমফান নামক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল। আমার ওই দিন টা এক দুঃস্বপ্নের দিন। আমফান ঝড় আমার বাড়ির সমস্ত বড়ো বড়ো গাছ গুলো উপড়ে দিয়েছিল। ঝড় আসার খবর আগে থেকেই পেয়েছিলাম সবাই। ২০১৯ সালে যে ঘূর্ণিঝড় টি হয় তার নাম ফনী , আমাদের এই এলাকায় ফনীর তান্ডব খুব একটা প্রভাব ফেলেনি তবে কিছু কিছু জায়গায় ফণী ও বেশ ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। সেই মর্মে সবার ধারণা ছিল যে আমফান সেরকম কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সবার সব অনুমান পেছনে ফেলে আমফান পুরো দিন জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ গাছ শিকড় সমেত উপড়ে রাস্তা, বাড়ি, ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে জনজীবনকে তীব্র অসুবিধার মুখে ঠেলে দিল। ঝড়ের ফলে এতো পরিমাণ ক্ষতি হয় য়ে প্রায় একমাস ইলেকট্রিসিটি বন্ধ ছিল। লক্ষ লক্ষ পশুপাখি ঘরছাড়া, শাবকেরা মাতৃ ছাড়া। আমফান ঝড় মানুষের সম্পত্তির পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীদেরও ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।

লকডাউনের জন্য সে সময়ে পরিকল্পনা করেও তা রূপায়িত করা গেল না।

এক বছর পেরিয়ে গেল, করোনার প্রভাব কিছুটা কমেছে। মহাবিদ্যালয় এর পঠন-পাঠন তখনও অনলাইন মাধ্যমে চলছে। স্যার, স্নাতকোত্তর বিভাগের সুমন কে বাদুড় নিয়ে কাজ করতে বলেন।

সুমন ছেলেটা বেশ কাজের, ও খোঁজ করতে করতে পৌঁছে যায় বাদুড় গ্রামে। সুমন বেশ কয়েকবার বাদুড় গ্রামে যায়, সেখানে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে সন্ধেবেলা ওর মেসে ফিরে আসে। যদিও সুমনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার ও বাদুর গ্রামে যায় বিভিন্ন তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করে। স্যার পরিকল্পনা করেন যদি ওই গাছে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে বাদুরের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ গুলো রেকর্ড করা হবে।

স্যার আমাকে বলেন একবার গিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে আসতে। আমিও সেই মত সুমনের সঙ্গে কথা বলে, ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে, একদিন ওর সাথেই বাদুড় গ্রামে পৌঁছে গেলাম। আমি যাব বলে সুমন আগে থেকেই ওই এলাকার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত যিনি আছেন তার সঙ্গে কথা বলে রাখেন। তাই ওই ভদ্রলোক ওইদিন উপস্থিত ছিলেন। মহিষাদল থেকে নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামে যাওয়ার

বাদুড়গ্রাম ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মানিক দাস
স্যাক্ট অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

সালটা ২০২০, আমাদের স্যার শুভময় বাবুর কাছে খবর আসে নন্দীগ্রামের একটি গ্রামে কয়েকটা গাছে হাজার হাজার বাদুড় বসবাস করে।

সেই মতো গ্রামটির ডাকনাম হয় বাদুড় গ্রাম। এই সংবাদটি স্যারের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্যারের কাছের বন্ধু, আনন্দবাজার পত্রিকার একজন সাংবাদিক আরিফ ইকবাল খান। খোঁজ শুরু হয় গ্রামটি কোথায়, ভাবা হয় গ্রামটিতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে আসার। কিন্তু চারিদিকে তখন নতুন এক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, যা কিনা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। মানুষের ঘর থেকে বেরোনোর নিষেধ। মানুষেরা গৃহবন্দি। লকডাউন নামক নিয়মের বেড়াজলে বন্দি দেশ ও পৃথিবী।

লকডাউন চলাকালীন আমফান নামক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল। আমার ওই দিন টা এক দুঃস্বপ্নের দিন। আমফান ঝড় আমার বাড়ির সমস্ত বড়ো বড়ো গাছ গুলো উপড়ে দিয়েছিল। ঝড় আসার খবর আগে থেকেই পেয়েছিলাম সবাই। ২০১৯ সালে যে ঘূর্ণিঝড় টি হয় তার নাম ফনী , আমাদের এই এলাকায় ফনীর তান্ডব খুব একটা প্রভাব ফেলেনি তবে কিছু কিছু জায়গায় ফণী ও বেশ ক্ষয়ক্ষতি করেছিল। সেই মর্মে সবার ধারণা ছিল যে আমফান সেরকম কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সবার সব অনুমান পেছনে ফেলে আমফান পুরো দিন জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ গাছ শিকড় সমেত উপড়ে রাস্তা, বাড়ি, ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে জনজীবনকে তীব্র অসুবিধার মুখে ঠেলে দিল। ঝড়ের ফলে এতো পরিমাণ ক্ষতি হয় য়ে প্রায় একমাস ইলেকট্রিসিটি বন্ধ ছিল। লক্ষ লক্ষ পশুপাখি ঘরছাড়া, শাবকেরা মাতৃ ছাড়া। আমফান ঝড় মানুষের সম্পত্তির পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীদেরও ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।

লকডাউনের জন্য সে সময়ে পরিকল্পনা করেও তা রূপায়িত করা গেল না।

এক বছর পেরিয়ে গেল, করোনার প্রভাব কিছুটা কমেছে। মহাবিদ্যালয় এর পঠন-পাঠন তখনও অনলাইন মাধ্যমে চলছে। স্যার, স্নাতকোত্তর বিভাগের সুমন কে বাদুড় নিয়ে কাজ করতে বলেন।

সুমন ছেলেটা বেশ কাজের, ও খোঁজ করতে করতে পৌঁছে যায় বাদুড় গ্রামে। সুমন বেশ কয়েকবার বাদুড় গ্রামে যায়, সেখানে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে সন্ধেবেলা ওর মেসে ফিরে আসে। যদিও সুমনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার ও বাদুর গ্রামে যায় বিভিন্ন তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করে। স্যার পরিকল্পনা করেন যদি ওই গাছে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে বাদুরের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ গুলো রেকর্ড করা হবে।

স্যার আমাকে বলেন একবার গিয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে আসতে। আমিও সেই মত সুমনের সঙ্গে কথা বলে, ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে, একদিন ওর সাথেই বাদুড় গ্রামে পৌঁছে গেলাম। আমি যাব বলে সুমন আগে থেকেই ওই এলাকার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত যিনি আছেন তার সঙ্গে কথা বলে রাখেন। তাই ওই ভদ্রলোক ওইদিন উপস্থিত ছিলেন। মহিষাদল থেকে নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামে যাওয়ার

রাস্তা হল তেরপেখা পৌঁছে, খেয়া পার করে নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ড যাওয়ার জন্য অটো বা টোটো ধরতে হবে। তেরপেখা থেকে নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ড প্রায় ৯ কিলোমিটার। নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড থেকে পায়ে হেঁটে বা টোটো ধরে আরো এক কিমি বাইপাসের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তারপর পাড়ার রাস্তা ধরে প্রায় কিলোমিটার দেড়েক হাঁটলে ধাউনখোওলার মল্লিক পাড়ায় পৌঁছানো যাবে। তবে নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটো ভাড়া করলেও যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু কুড়ি টাকা করে ভাড়া নেয়।

সুমন ও আমি দুজনেই হাঁটতে পছন্দ করি, তাই নন্দীগ্রাম বাস স্ট্যান্ড থেকে মিনিট কুড়ি হেঁটেই আমরা বাদুড় গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

সুমন এর আগেও বার চারেক এসেছে এখানে কিন্তু আমি প্রথমবার এলাম তাই আমার উত্তেজনা একটু বেশিই ছিল। আশপাশের গোটা পাঁচেক গাছ মিলিয়ে মোট হাজার তিনেক বাদুড় উপস্থিত ছিল ওই সময়। হঠাৎ একসাথে এতগুলো বাদুড় দেখার যে আনন্দ সেটা ভাষায় ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কয়েক মিনিট ধরে তাদের আচরণ রেকর্ড করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ভিডিও স্যারকে পাঠালাম। ভদ্রলোক জানান আমফান ঝড়ের আগে আরো অনেক বাদুড় ছিল ও আরো কয়েকটা গাছও ছিল যেগুলো ঝড়ে উপড়ে পড়ে তাই বাদুড়ের সংখ্যাটা কিছুটা কমে গেছে।

আশপাশটা ঘুরে দেখলাম, আসলে ওটা একটা কবর স্থান , পবিত্র স্থান তাই খালিপায়েই এদিক ওদিক হেঁটে দেখতে লাগলাম। চারিদিকে বাদুড়ের মল পড়ে আছে, আর ওদের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ। বেশিরভাগ বাদুড়ই বেশ বড়ো,

ডানা দুটি মিলে ধরলে প্রায় আড়াই থেকে তিন ফুট চওড়া তো হবেই। এর আগেও অনেক বাদুড় দেখেছি তবে একসাথে এতো এর আগে দেখিনি। স্থানীয় পঞ্চায়েত যিনি ছিলেন উনার সঙ্গে কথা বললাম। স্যারের পরিকল্পনা ওনাকে বোঝালাম। উনি পরিকল্পনা শুনে বেশ খুশি। উনিও চান আরো বেশি বেশি মানুষ এই বাদুড় গ্রাম সম্পর্কে জানুক যাতে বাদুড় সংরক্ষণে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়। উনি স্থানীয় এক বাড়ির সাথে আমাদের কথা বলিয়ে দিলেন। যেখান থেকে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দিষ্ট স্থান এবং ইলেকট্রিসিটি পেয়ে যাবো। যে বাড়ির সঙ্গে আমরা কথা বললাম তিনিও আগ্রহের সহিত বলেন 'আপনারা আসুন কোন অসুবিধে হবে না' ।

কোন গাছের কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা রাখা যায় তা স্থির করলাম এবং বাড়িটা থেকে আনুমানিক দূরত্ব নিলাম। ওই কবরস্থানের ওপর দুটো বড়ো বড়ো শিরিস গাছ আছে যেখানে বাদুড়গুলো আছে। ঠিক তার কাছেই একটা গাছ আছে যার উচ্চতা কিছুটা কম, ঠিক করলাম ওই গাছের ওপর একটা বড়ো বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে তাতে ক্যামেরা বসালে ভালো ছবি পাওয়া যাবে। সেই মতোই পরিকল্পনা করলাম দুটো বা তিনটে ক্যামেরা বসানো হবে। ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করতে করতে প্রায় সাড়ে তিন টা বাজে। আমি জিজ্ঞেস করলাম সুমন থাকবি না বাড়ি যাবি। ও উত্তর দিল স্যার এখন তো সবে সাড়ে তিনটা আরো ঘন্টা দুয়েক থাকবো তারপর বাসায় ফিরবো।

কিন্তু আমার তো ফেরার তাড়া আছে, তাই ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে উনি আর আমি দুজনেই আবার হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় অর্ধেক রাস্তা আসার পর ওই ভদ্রলোক অন্য একটি রাস্তা ধরলেন আর

আমি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর রাস্তায় হাঁটতে থাকলাম। পায়ে হেঁটে এসেছিলাম বলেই রাস্তাটা চেনা হয়ে গেল তাই একাই বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। স্যারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে।

কিন্তু আবার সেই করোনার প্রভাব বাড়তে থাকায় নতুন করে লকডাউন শুরু হয় ও সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই ২০২১ সালেও নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো গেল না।।

পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে শুরু করে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন আবারও ক্লাস রুমে বসে শুরু হয়। ২০২২ সালে নতুন করে উদ্যোগ নেয়া হয় নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর।।

কিন্তু সুমন নেই, ওর দু বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ হয়ে গেছে, ও পাস করে বেরিয়েও গেল। তবে এই বছর যারা স্নাতকোত্তর পড়ছে তাদের মধ্যে একজনের বাড়ি নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামের খুব কাছাকাছি। তবে সে ছাত্রী, নাম মারিয়া, বাদুড় নিয়ে কাজ করার জন্য ওকে বলা হলো। মারিয়া রাজিও হয়, বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় মারিয়া বাদুড় গ্রাম সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো। এটা একদিক থেকে সুবিধের। তবে ছাত্রীরা ফিল্ডের কাজ করতে খুব একটা পছন্দ করেনা। তাই স্যার সবসময় চিন্তায় থাকতেন। আমি আবারো বাদুড় গ্রামে পৌঁছায় তবে এই দিন আমি একা যায়নি আমার সঙ্গে আমাদের স্যার ছিলেন ও আরো দুজন ছাত্র ছিল, অম্লান ও স্নেহাশীষ। আমরা নন্দীগ্রাম বাস স্টপ থেকে টোটো নিয়েই ধাউনখোল্যার মল্লিক পাড়ায় পৌঁছে গেলাম। আমরা যাচ্ছি শুনে মারিয়া ওইদিন সকাল থেকেই ওখানে উপস্থিত ছিল। ওখানে পৌঁছানোর পর আবারো পরিকল্পনা শুরু হলো। তবে আমার কাছে ওখানের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফোন নাম্বার ছিল না তাই আমি সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উনার ফোন নাম্বার জোগাড় করি।

স্যার, আরিফ ইকবাল খানের সঙ্গে কথা বলে, ওই ব্যক্তির ফোন নাম্বার জোগাড় করেন।

কথা হয়, উনি কিছু সময়ের মধ্যেই ওখানে উপস্থিত হয়। এই সময় আমরা এদিক-ওদিক ঘুরে কোন গাছে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো যেতে পারে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করলাম। গত বছর যে পরিকল্পনা করেছিলাম সে গাছটা মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। তাই সে পরিকল্পনা কাজে লাগল না।

নতুন করে পরিকল্পনা করা হলো দুটো সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে নারকেল গাছ থেকে, যেগুলো অনেকটা দূর থেকে গাছগুলোতে থাকা বাদুড়ের ক্রিয়াকলাপ রেকর্ড করবে। আমি আবারো ওই বাড়িটার সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু ওই বাড়িতে মালিক না থাকায় তিনি রাজি হলেন না। তাই পাশের একটা বাড়ির সঙ্গে কথা বললাম সিসিটিভির যন্ত্রপাতি রাখার জায়গা এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। উনি রাজি হলেন।

ওই দিন আমরা ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু বাদুড়ের কঙ্কাল পেয়েছিলাম। তবে কোন একটা বাদুড়ের সম্পূর্ণ দেহের অংশ পাওয়া যায়নি। সেদিন ওখান থেকে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। সুব্রত দা যিনি আমাদের কলেজের সমস্ত কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি দেন উনার সঙ্গে কথা হলো, সিসিটিভি সমস্ত যন্ত্র উনি দেবেন। সেইমতো সুব্রতদা দুটো সিসিটিভি ক্যামেরা , হার্ডডিস্ক এবং বাকি যাবতীয় সরঞ্জাম এনে আমাদের বিভাগে দিয়ে যান। এরপর প্রায় কুড়ি - বাইশ দিন কেটে যায়, সুব্রত দার ফাঁক পাওয়া গেলে যায়নি। তাই যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সিসিটিভি চালু করা যায়নি। একদিন স্যার বললেন সিসিটিভি ক্যামেরা

বসানো নিয়ে আমরা কি ভাবছি, পরিকল্পনাটা সফল করা হবে কিনা। কিন্তু সিসিটিভি চালু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সম্পূর্ণভাবে সুব্রত দার উপর নির্ভর করতে হলো। বারে বারে সুব্রতদাকে ফোন করে দ্রুত কাজটি করতে বলা হয়।। সুব্রতদা একদিন আসে এবং সিসিটিভি চালু করে দিয়ে যান। আমি পরিকল্পনা করি ঠিক তার পরের দিন ক্যামেরার বসানোর, কিন্তু স্যার ব্যস্ত থাকায় ওইদিন ক্যামেরা বসানো সম্ভব হয়নি। আরো একদিন পর ক্যামেরা বসানোর দিন ঠিক করা হয়।

সেই মতো সমস্ত যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, হার্ডডিস্ক, তার এবং ক্যামেরা বসাতে যা যা লাগতে পারে সেরকম কিছু কিছু উপকরণ আমরা বিভাগ থেকে নিয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গে আরও চারজন ছাত্র গেল। আমাদের সঙ্গে স্যার যাবেন বলেছিলেন কিন্তু কাজ থাকায় স্যার পরে পৌঁছে যাবেন বললেন। তাই আমরা পৌঁছে গেলাম, কাজও শুরু হল। যে বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই পাওয়া যাবে এবং কোথায় সিসিটিভির মনিটর বসানো হবে তা ঠিক করা হলো, দুটো ক্যামেরার জন্য দুটো তার মেলা হল।

কিন্তু পরিকল্পিত স্থানে গাছে উঠে ক্যামেরা বসানোর মতো কাউকে পাওয়া গেল না। স্নেহাশীষ প্রথমে চেষ্টা করে কিন্তু নারকেল গাছে ওঠার অভ্যাস না থাকায় ও কিছুক্ষণ পরেই গাছ থেকে নেমে আসে। শেষমেষ আমি গাছে উঠি। আমারও নারকেল গাছে ওঠা অভ্যেস নেই। তাও প্রায় ১৫ ফুট ওঠার পর একটা মোটা ন্যাঠি নারকেল গাছের সঙ্গে বেঁধে বসার মতো জায়গা করে নিই। এরপর কাজটা একটু সহজ হয়ে যায়। সুব্রত তা যেমনভাবে সমস্ত যন্ত্রপাতি চালু করে দিয়েছিলেন সেভাবেই আমরা ওখানে গিয়ে বসাই এবং চালু করি সবকিছু ঠিক থাকে একটা ক্যামেরা নির্দিষ্ট স্থানে বসে যায় ছবি রেকর্ড হওয়া শুরু হয়। প্রথম ক্যামেরাটি যে নারকেল গাছে বসানো হয় সেখান থেকে একটি কাউ গাছ ফোকাস করা হয়। কাউ গাছ টি প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট দূরে তাই গাছ বোঝা গেলেও গাছে থাকা বাদুড় গুলো খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রায় আধা ঘন্টা মতো প্রথম নারকেল গাছে ন্যাঠির উপর বসে থাকায় আমার দুটি পায়ে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাই গাছ থেকে নামার সময় রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয়। গাছ থেকে নামতেই হবে, হাতের উপর বেশি জোর দিয়ে গাছ থেকে নামলাম।

কষ্ট করে একটা ক্যামেরা বসানো হলেও ভালো ছবি না আসায় মনের মধ্যে শান্তি এল না।

স্যারকে ফোন করা হলো, পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানানো হলো।

তাই দ্বিতীয় ক্যামেরাটি বসানোর পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হলো। বড়ো বড়ো শিরিস গাছ দুটির কাছাকাছি থাকা একটা নারকেল গাছের ওপর ক্যামেরাটি বসানো হবে ঠিক করলাম। কিন্তু নারকেল গাছের উপর আবারো উঠতে হবে !

আমার পায়ের রক্ত চলাচল শুরু হলেও পা দুটি এখনো তার নিজের হাতে ফিরে আসেনি। তাই পুনরায় নারকেল গাছে ওঠার দুঃসাহসিকতা দেখালাম না। আমাদের কর্মকাণ্ড দেখে স্থানীয় দুটি ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে একজন অ্যালকোহলে ভোরা ছিল, আর একজন অল্প বয়সী। ওরা ভাবল আমরা হয়তো বাদুড় মারতে এসেছি, তাই বাদুড় রক্ষার তাগিদে আমাদের দিকে ছুটে এল। যখন দেখে আমাদের হাতে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং তাদের রেকর্ড রুমে তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস

করল আপনাদের কোন কাজে সাহায্য করতে পারি। আমার মুখে আবারো হাসি ফিরে এলো। বলা হলো কেউ নারকেল গাছে উঠে এই ক্যামেরাটা বসাতে পারবে কিনা। অল্প বয়সী ছেলেটা রাজি হল। আমি ছেলেটাকে বললাম কিভাবে এবং কোন দিকে ক্যামেরাটা বসানো হবে। সেই মত ছেলেটা গাছে উঠে। সত্যি অবাক হলাম। আমরা গ্রামে বাস করেও নারকেল গাছে উঠতে ভয় পাই , একটা অল্প বয়সী ছেলে ক্লাস টেনে পড়ে, নারকেল গাছে উঠলো না সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল বোঝা গেল না। ততক্ষণে আমি সিসি টিভির মনিটরের কাছে এসে বসলাম। ওই দিন মারিয়াও এসেছিল, সেও বসে আছে। অম্লান স্নেহাশিস মারিয়াকে ঠান্ডা জল আনতে বলেছিল, তাই সে বাড়ি থেকে ঠান্ডা পানীয় জল নিয়ে এসেছিল, যেটা আমাদের কাজের মাঝে খুবই প্রয়োজনীয়। যদিও আমাদের কাছে কিছু পরিমাণ জল ছিল কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়।।

ছেলেটা নারকেল গাছের ওপর বসে দ্বিতীয় সিসিটিভি ক্যামেরাটা বসাচ্ছে, অম্লান ও স্নেহাশীব নিচ থেকে ছেলেটাকে নির্দেশ দিচ্ছে, আমি বাড়ির মধ্যে বসে ফোনের মাধ্যমে অম্লান ও স্নেহাশিস কে ক্যামেরার অভিমুখ ও ফোকাস সম্পর্কে বলে যাচ্ছি। সেই মতো কাজ চলছে। নারকেল গাছের ওপর ছেলেটা বারবার ক্যামেরার বসানোর চেষ্টা করছে কিন্তু ঠিকমতো জায়গা না পাওয়ায় ক্যামেরাটা সরে যাচ্ছে। প্রায় আরো আধঘন্টা কেটে গেল। ছেলেটা গাছের উপর আমাদের নির্দেশ মতোই ক্যামেরাটা বসালো।

দ্বিতীয় ক্যামেরা থেকে যে ছবি পাওয়া গেল তা খুব একটা খারাপ নয়। বিকেল বেলা তাই আলোর পরিমাণ কম কিন্তু আমার মনে হল রাত্রিতে আরও ভালো ছবি পাওয়া যাবে। সবকিছু ঠিক থাকায় ছেলেটাকে গাছ থেকে নামতে বলা হলো, আবারও এক অবাক কান্ড।

যদিও তখন আমি ওখানে ছিলাম না, অম্লানের কথায় ছেলেটা গাছ থেকে এমন ভাবে নামলো যেমন বৃষ্টির জল গাছের গা বেয়ে নেমে আসে। কাজ প্রায় শেষ। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বললাম, এক মাসের মতো সিসিটিভি রাখা হবে জানালাম।

আমি বাড়ি থেকে কিছু দড়ি ও আরো কিছু সরঞ্জাম নিয়ে গেছিলাম এবং বিভাগ থেকেও কিছু সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সবকিছু গোছানো হলো।

দীর্ঘ চার ঘণ্টার পরিশ্রমের পর দুটো ক্যামেরা বসানো হলো , মোটামুটি ফোকাস পাওয়া যাচ্ছে, তবে প্রথম ক্যামেরা থেকে দ্বিতীয় ক্যামেরাটির ফোকস ভালো বোঝা যাচ্ছে। বাদুড় উড়ে উড়ে আসছে , গাছের ডালে বসছে। সিসিটিভির ক্যামেরায় তা ধরা পড়ছে।

ওইদিনের কাজ শেষে আমরা আবার রহনা দিলাম বাড়ি ফেরার জন্য। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। নন্দীগ্রাম বাস স্টপ থেকে আবার অটো ধরে তেরপেখা, তারপর তারপেখা থেকে যে যার বাড়ির দিকে চলে এলাম। অম্লান স্নেহাশীষ কলেজ থেকে নিয়ে যাওয়া কাগজের বাক্সটা ওদের মেসে নিয়ে গেল।

ক্যামেরা বসানোর দিনটা ছিল ২৭ এপ্রিল।

দুই সপ্তাহ হয়ে গেল সিসিটিভি ক্যামেরা গুলো তাদের কাজ করে যাচ্ছে।

আমি মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিভাগ থেকে ওকে একটি হার্ডডিস্ক দেওয়া হয় । মারিয়া

দুই দিনের মধ্যেই রেকর্ড করা কিছু ছবি আমাদের দিয়ে যায়।

কিন্তু যান্ত্রিক কারণে ছবিগুলো সরাসরি দেখা গেল না। অনেক চেষ্টার পর যদিও দেখা গেল কিন্তু দ্রুত গতিতে ভিডিওগুলো দেখার গেল না। তাই সাগ্নিক গুগল থেকে কনভার্টার সফটওয়্যার ডাউনলোড করল। আবারো অনেক চেষ্টার পর কয়েকটা ভিডিও আমরা দেখতে পেলাম। দু সপ্তাহের রেকর্ড করা দুটো সিসিটিভি ক্যামেরায় প্রায় ৯০০ জিবি ভিডিও ডেটা সংগ্রহ করেছে।

এই বিপুল পরিমাণ ভিডিও কনভার্টার সফটওয়্যারে কনভার্ট করে দেখা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ কাজ। কতগুলো ভিডিও দেখা হল। দিনে ও রাতে বাদুড়দের ক্রিয়াকলাপ কিছু ধরা পড়েছে ক্যামেরায়, তবে দিনের থেকে রাতের ছবি আরো ভালো। কষ্ট করে ক্যামেরা বসানো মনে হয় সফল হলো। কিন্তু এই সামান্য কষ্টেই সফল হওয়া যায় না তা আবারও বুঝতে পারলাম পরবর্তী কয়েকটা ভিডিও দেখে।

হঠাৎ চোখে পড়লো দ্বিতীয় ক্যামেরাটি তার স্থান থেকে সরে গেছে। আবারো মাথায় হাত।

এক মুহূর্তে মনে হল এতগুলো মানুষের এত পরিশ্রম সব বিফল হল। স্যার বললেন "আমরা কি কখনোই সফল হবো না"।

স্যারের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আবারো পরিকল্পনা হল আরেকবার গিয়ে ক্যামেরাটাকে নতুন করে বসানো হবে।

অম্লান স্নেহাশীষ দের পরীক্ষা চলছে, তাই ওদের পরীক্ষার মাঝেই একটি দিন ঠিক করা হলো। আবার গিয়ে ক্যামেরা দুটিকে নতুন জায়গায় বসানো হবে।

ক্যামেরা বসানোর প্রায় দুই মাস হয়ে গেছে তাই যেই বাড়িটাতে আমরা ক্যামেরা বসিয়েছিলাম সেখান থেকে বার কয়েক ফোন এসেছিল ক্যামেরাগুলো খোলার জন্য। কিন্তু কিছু ব্যস্ততার মধ্যে আরো কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল।

শেষমেষ ক্যামেরা গুলো স্থান পরিবর্তন করার দিন ঠিক করা হয় তারিখ ২০ শে জুলাই বুধবার। একটু ভেবেচিন্তেই নন্দীগ্রাম যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করতে হলো কারণ এখন প্রায় সমস্ত সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্র এই কাজে যুক্ত তাদের পরীক্ষা চলছে।

তাই অম্লান স্নেহাশীষদের পরীক্ষার মাঝেই দিন ঠিক করতে হলো। কারণ ওরা না থাকলে আমি একা কোন কাজই করতে পারবো না। অম্লান স্নেহাশিস এখন আমাদের বিভাগের দুই হাত হয়ে গেছে। যেকোনো কাজে ওরা সব সময় থাকে এবং নিষ্ঠা সহকারেই কাজগুলো করে। কিন্তু খুব দুঃখ হয়, এতবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের এরকম কাজের মধ্যে আনা যাচ্ছে না। হয়তো এটা আমাদেরই দুর্বলতা, আমরা পারছি না ।

সে যাই হোক, চললাম আবার নন্দীগ্রামের বাদুড় গ্রামের পথে।

তবে এবারে জনসংখ্যা খুবই সীমিত আমি অম্লান ও স্নেহাশীষ। গতবারে নারকেল গাছে ওঠার অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বিভাগের জন্য আনা নতুন অ্যালুমিনিয়ামের মই খানা নিয়ে গেছিলাম। মই টির দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট। ওজন কেজি দশেক তো বটেই। অম্লান ওটাকে একাই নিয়ে গেল। আমি কয়েকবার চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে দিল না। তবে যাওয়াতে অসুবিধা হয়নি নন্দীগ্রাম বাস স্টপেজ থেকেও এবারও আমরা টোটো নিয়ে গেছিলাম। এই দিন পৌঁছতে প্রায় দুপুর দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন পৌঁছলাম ওই

বাড়িটার সবাই দুপুরের আহারে বসেছে। তাই উনাদের সঙ্গে অনেকটা পরেই যোগাযোগ হল। সিসিটিভি ক্যামেরা যখন বসানো হয় একমাস রাখার কথা বলেছিলাম কিন্তু বর্তমানে প্রায় দুই মাস ছাড়িয়ে গেছে। তাই ওই পরিবারের ব্যক্তিগণ আমাদের ওপর খুশি নয়। তা সত্ত্বেও আমরা পরিকল্পনা মতোই গেলাম। আমি বলেছিলাম সিসি টিভি ক্যামেরার জন্য যে পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি খরচ হবে আমাদের বিভাগ থেকে সেটা দেওয়া হবে। তাই বিদ্যুতের খরচ বাবদ আমি কিছু টাকা উনার হাতে দিই। উনার কাছ থেকে আমরা আরও একমাস সময় চেয়ে নিই।

এরপরেই আমাদের কাজ শুরু হয়। দুটো সিসিটিভি ক্যামেরা খোলা হবে নতুন জায়গায় বসানো হবে। দুপুর বেলার জন্য আমাদের একই সমস্যায় আবারো পড়তে হয়। নারকেল গাছে উঠে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো খোলার মতো কাউকেই পেলাম না। তাই আমি প্রস্তুতি নিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের মইটাকে গাছের ওপর লাগিয়ে আবার কাজে লেগে পড়ি। মই টা থাকায় অনেক সুবিধে হল। ২০ ফুটের মধ্যে ১৩ ফুট ওপরে উঠেই গেলাম, হাতটা বাড়িয়ে ক্যামেরা খোলার মত বসার জায়গা করা হলো। একটা মোটা লাঠি স্নেহাশীষ এনে দিল। মজার কথা, দু'মাস আগে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য যেই লাঠিটা বেঁধে আমি কাজ করেছিলাম ওটাই স্নেহাশীষ খুঁজে আনল। দড়ি দিয়ে নারকেল গাছের ওপর লাঠিটা বাঁধলাম ।ওখানে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রথম ক্যামেরাটা খুলে নিলাম। সহজে নিচে নেমেও এলাম। এবারে খুব একটা সমস্যা হয়নি। কিন্তু পরের কাজটাই সমস্যায় পড়তে হলো। প্রথম ক্যামেরা খোলার পরে নতুন জায়গায় যেখানে বসানোর কথা ভাবলাম সেখান পর্যন্ত ক্যামেরার তার কম পড়ছে। ভীষন সমস্যায় পড়লাম। নতুন করে তার আনা হয়নি। তাই একাধিক নতুন পরিকল্পনা করায় অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন কাজে আমরা এগোতেই পারছি না। অম্লান ও স্নেহাশীষ এদিক-ওদিক খোঁজ লাগালো কিন্তু নারকেল গাছে ওঠার মতো কাউকেই পাওয়া গেল না। যারা গাছে উঠতে পারে তারা বিদ্যালয় আছে। তাই কোন বিকল্প না দেখে দ্বিতীয় নারকেল গাছটাতে আমি উঠতে লাগলাম। মইটা দিয়ে প্রথম ১৩ ফুট খুব সহজেই উপরে উঠা গেল, বাদবাকি টাও উঠে গেলাম।

গাছে ওঠায় পটু না হলেও উঠে গেলাম। দুই হাত দিয়ে দুটো নারকেল পাতা ধরে গাছের ওপর গিয়ে বসলাম। গাছের উপরে কাঠপিঁপড়ে কিছু আছে। নাড়া পেয়ে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার খোঁজ করছে। কিছু আমার পায়ে উঠতে শুরু করল আর কেউ কামড়ানো চেষ্টা করছে। দু-একটা পিঁপড়ের কামড় খেতেও হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পিঁপড়ে গুলো শান্ত হল আমি কাজ শুরু করলাম। ক্যামেরাটা ওখান থেকে খুলে নতুন করে বাধার চেষ্টা করছি। নতুন জায়গায় বসানো হলো। কিন্তু নিচ থেকে অম্লান বলে উঠলো স্যার ক্যামেরার সিগন্যাল নেই। মনে হলো ছোটখাটো সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে। গাছের উপর থেকেই অম্লানকে বললাম পুরো সিস্টেমটা একবার বন্ধ করে চালু করতে। অম্লান তাই করল কিন্তু কোন ফল হলো না। অনেক চেষ্টার পরেও ক্যামেরা কাজ করছে না। আমি ক্যামেরাটা বসালাম। নারকেল গাছের যে পাতায় আমি বসে ছিলাম হঠাৎ করে সেটা ভেঙে গেল। পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ার আগেই আমি পাতা টা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। নারকেল পাতাটা ভেঙে যাওয়ায় আমার ভয় লাগতে শুরু করে। একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে ঘিরে ফেলে। যদিও গাছের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম তা সত্ত্বেও পা দুটো কাঁপতে শুরু করে। এই অবস্থায় গাছ থেকে নিচে নামবো কি করে সেই চিন্তা বড় হয়ে দাঁড়ায়। ক্যামেরাটা নতুন

জায়গায় বসানো হলো, কিন্তু ক্যামেরার থেকে কোন ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। সুব্রত দা কে ফোন করতে বলি, স্নেহাশীষ সাগ্নিক কে ফোন করে সুব্রত দার ফোন নাম্বার জোগাড় করে, সুব্রত দাকে ফোন করা হয় কিন্তু সুব্রত দার কথায় মনে হয় তারটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় গাছ থেকে কোনরকমে নিচে নামলাম। গাছ থেকে নামার পর পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাড়ানোই সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। কোন রকমে মনিটরের কাছে পৌঁছায়। আমিও পুনরায় সুব্রতদার সঙ্গে কথা বলি কিন্তু কোন রকম শুরাহা হল না।

তখন মনে হলো এখানেই সব শেষ।

বিকেল তখন প্রায় প্রায় পাঁচটা, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। যে ছেলেটা গতবার আমাদের কাজে সাহায্য করেছিল তাকে অম্লান দেখতে পেল। পুনরায় গাছে ওঠার কথা বলা হল। সে আমাদের কোথায় রাজি। দ্বিতীয় নারকেল গাছটাতে উঠে ক্যামেরাটা খুলে নামিয়ে দিল। অম্লান ক্যামেরাটা হাতে পাওয়ার পর দেখল প্লাগ থেকে জল বেরোচ্ছে। তাই ও পুরোটা খুলে জলটা পরিষ্কার করে আবার জুড়ে দেয়। হঠাৎ করেই দ্বিতীয় ক্যামেরার ছবি ফিরে আছে। মনে কিছুটা শান্তি আসে। ওই ছেলেটাকে গাছ থেকে নামতে বারণ করা হয়। দ্বিতীয় ক্যামেরাটা আবার বসানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদের কথা মতো ওই ছেলেটি দ্বিতীয় ক্যামেরাটি কে নারকেল গাছের ওপর ঠিকভাবে বসিয়ে দেয়। মোটামুটি যে ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে বাদুড়দের কিছু ছবি পাওয়া যাবে। তাই দ্বিতীয় ক্যামেরাটা ওই অবস্থায় ছেড়ে প্রথম ক্যামেরাটা বসানোর কাজে লেগে পড়ি। পরিকল্পনা হয় একটা বাঁশ জোগাড় করে ক্যামেরাটা বাঁশের ওপর বসিয়ে একটা গাছে বাঁধা হবে। কিন্তু বাঁশ পাওয়ারও সমস্যা হয়ে গেল। যে ভদ্রলোকের বাড়িতে সিসিটিভির সমস্ত যন্ত্র রাখা আছে, উনার ঘরের সামনেই একটি লম্বা বাঁশ পড়ে আছে কিন্তু উনি দিতে রাজি নন। খোঁজ করার পরেও যখন বাঁশ পাওয়া গেল না তখন স্নেহাসিস কে বললাম, যে কোন জায়গা থেকে টাকা-পয়সা দিয়ে একটা বাঁশ কিনে আন। স্নেহাশীষ ওই ভদ্রলোকটিকে আবারো বলে। আমরা বাঁশ কিনতে চাইছি এই কথাটা শুনে উনি মত পরিবর্তন করে আমাদের সাহায্য করলেন। ঘরের বাইরে পড়ে থাকা বাঁশটা আমাদের ব্যবহার করতে বলেন। একটা সমস্যার সমাধান হলো

কিন্তু অসাবধানতার জন্য ক্যামেরার তারটি জলে পড়ে যায় আর তারের প্লাগ পয়েন্ট ভিজে যায়। তাই দ্বিতীয় ক্যামেরা থেকেও ছবি পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কাজ বন্ধ না করেই পরিকল্পনা মাফিক চালিয়ে গেলাম। কিছু সময় পর প্রথম ক্যামেরা থেকেও ছবি পাওয়া গেল। কিন্তু বাঁশটা প্রায় ৩০ ফুট লম্বা, কাঁচা ও আছোলা। তাই ওটা বসাতেও সমস্যায় পড়তে হয়। এতো ভারী বাঁশ গাছের উপর তুলে বাঁধা সহজ নয়। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, কাজ দ্রুত শেষ করে বাড়ির ফিরতে হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবল এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করলো। ওই বাঁশটাকে মাটি থেকে অনেকটা উপরে তুলে গাছের ওপর বাধা হল। বাঁশের ওপর যে ক্যামেরা বসানো হলো তা থেকে মোটামুটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় প্রথম ক্যামেরাটা ওই অবস্থায় বসিয়ে আসতে হলো। বাঁশটা আরো লম্বা হলে ভালো হতো। বাড়ি ফেরার পথে সিদ্ধান্ত নিলাম কিছুদিন পর গিয়ে প্রথম ক্যামেরাটা আরো উঁচুতে তুলে বাধা হবে। আমরা তিনজনে ক্লান্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে নন্দীগ্রামের বাদুড়গ্রাম থেকে বাড়ির জন্য রওনা হলাম।

দুটো ক্যামেরা থেকেই ছবি পাওয়া যাচ্ছে ও সেগুলি রেকর্ড হচ্ছে। আশা করি ক্যামেরা দুটি যে ছবি রেকর্ড করবে তা আমাদের কাছে বাদুড়ের আচরণ বোঝার হাতিয়ার হবে।

নাছোড় জিদ্দি স্বর্ণ মানবী:- ম্যানগোল্ড

সুরেখা চৌধুরী
SACT অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

"মরন এলে হঠাৎ দেখি, মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো"....

স্নিগ্ধ সকালের মিষ্টি সূর্য মধ্যগগনে যে তেজের সাথে পৃথিবীকে আপন করে নেয়, দিনের শেষে হঠাৎই সেই তেজ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। তখন ইচ্ছে হয় আরেকটু তাপ গায়ে মাখি, তার একটু উষ্ণতা হাতের মুঠোয় ধরে রাখি। কিন্তু ভালো জিনিস ক্ষনস্থায়ী বলেই তা ভালো....প্রকৃতির নিয়মেই তাকে মহাশূন্যে বিলীন হতে হয়। বিজ্ঞানের মহাকাশে এরকম অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের আলো অনন্তকাল পৃথিবীকে আলোকিত করলেও নিজেরা অন্ধকারের হাতলে তলিয়ে গেছে। এরকমই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সন্ধানে গিয়েছিলাম। হঠাৎই দেখলাম এক পঁচিশ বছরের নবীন তারকা আবিষ্ট করছে আশেপাশের সমস্ত নক্ষত্রমন্ডলীকে। আমিও আবিষ্ট হলাম.....কাছে গেলাম......অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করলাম তাঁর জীবনযুদ্ধ।

সালটা ১৮৯৮, ২০ শে অক্টোবর পূর্ব-মধ্য জার্মানীর থুরিংগিয়া শহরে আর্নস্ট প্রেসকোল্ট এবং গার্টুডের সংসার আলো করে জন্ম নিলেন এক অগ্নিকন্যা....নাম হিল্ডে প্রেসকোল্ট।

দু চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে ১৯১৮ সালে জার্মানির জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দুই সেমিস্টার পড়াশুনা করার পর ১৯১৯ সালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই প্রথম আবিষ্ট হওয়ার পালা....আবেশকারী তৎকালীন বিখ্যাত ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ এবং বৈজ্ঞানিক হ্যান্স স্পীম্যান। তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ পেলেন এই সদ্য স্বপ্নডানা মেলা নবীন প্রতিভার। জহুরীর চোখ জহর চিনতে ভুল করে না। হিল্ডেকে চিনে নিতেও ভুল করলেন না স্পীম্যান।

পি এইচ ডি তে যোগ দিলেন হিল্ডে। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ন সময়েই স্পীম্যানের সহকারী ওট্টো ম্যানগোল্ড এর প্রেমে পড়েন ... পরিনতি বিয়ে। কিন্তু নিজের স্বপ্নের হাত ছাড়েননি তিনি। ১৯২৩ সালে পি এইচ ডির গবেষনা পত্র জমা দেন। গবেষনার বিষয়বস্তুও আবেশ।

প্রতিটি পথচলা শুরু হয় বিন্দু থেকে। আমাদের সৃষ্টির রহস্যেও সেই একটি বিন্দু....একটি কোষ। এক থেকে দুই...দুই থেকে চার....চার থেকে আট....এই ভাবে ভাঙতে হয় নিজেকে নতুন কিছু গড়ার জন্য। স্পীম্যান এবং হিল্ডে ম্যানগোল্ডের গবেষনালব্ধ ফল বলে এই ভাঙা-গড়ার খেলায় একটি কোষ তার পাশের কোষটিকে আবিষ্ট করে Sinductive signalV কোনো এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। একটি দলা পাকানো কোষ সমষ্টির মধ্যে বিশেষ কিছু কোষ যারা অন্যান্য কোষের গন্তব্য ঠিক করে দেয় তাদেরকে বলা হয় অর্গানাইজার। বিভিন্ন পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেন ম্যানগোল্ড যে, এই অর্গানাইজার প্রতিস্থাপিত হলে কোষদের উদ্দেশ্য বদলে যেতে পারে। এই অভূতপূর্ব সৃষ্টির জন্যই আজও বেঁচে আছেন বহু মানুষঙ্কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রতিস্থাপনের মূল বীজ রোপন করেছিলেন ম্যানগোল্ড। কিন্তু ভালো শব্দটা ভীষন ক্ষনস্থায়ী তাই ম্যানগোল্ডের এই স্বর্নাভ আভা বেশিদিন স্থায়ী হল না।

১৯২৩ সালেই ম্যানগোল্ডের কোল আলো করে জন্ম নেয় ক্রিশ্চিয়ান। তখন তাঁর চোখে সুন্দর এক পরিবারের স্বপ্ন। বিজ্ঞানের আঙিনায় দাঁড়িয়েও সদ্য মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছেন মা ম্যানগোল্ড। ছেলের বয়স তখন এক বছর মাত্র....সালটা ১৯২৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর....মা তাঁর সন্তানের জন্য পরম স্নেহ এবং যত্নে দুধ গরম করতে ব্যস্ত। এদিকে অগ্নিকন্যা জানেও না, তাকে স্বয়ং অগ্নিদেব আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে....সে এক ভয়ানক দৃশ্য।

ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গোলার মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে ম্যানগোল্ডের আত্মচিৎকার....চিৎকার নয়, হারতে না চাওয়ার জেদ। শাশুড়ি এবং স্বামীর শত চেষ্টাতেও সেই আগুন নিভল না।চিরতরে হারিয়ে গেলেন ম্যানগোল্ড....চারিদিকে নিস্তব্ধতা আর ছোট্টো ক্রিশ্চিয়ানের মা কে না পাওয়ার আকুতি। সামনের ছাব্বিশতম জন্মদিন পালন করা হল না, চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী পড়ে রইল...আর পড়ে রইল নোবেলের মঞ্চ।

ম্যানগোল্ডই বোধ হয় প্রথম ডক্টরেট যাঁর থিসিস নোবেল এনে দিয়েছিল তাঁর গুরু স্পীম্যানকে। অথচ সেই পুরস্কার কোনোদিনও ছুঁতে পারলেন না ম্যানগোল্ড। বিজ্ঞান ভয়ানক কিনা জানি না, তবে বিজ্ঞানের ইতিহাস অতি ভয়ানক। প্রতিটি আবিস্কারের পিছনে রয়েছে রক্তক্ষনী সংগ্রাম...যার ফলস্বরূপ হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছি প্রতিনিয়ত।

এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের চোখে চোখ রেখে দেখলাম , এক বিজ্ঞানীর যন্ত্রনা, এক মায়ের বুক ফাটা হাহাকার, এক স্ত্রীর স্বপ্নের অনেকগুলি বসন্তের ভাঙা ছবি। পৃথিবীতে হয়তো তোমায় ভুলে যাবে কিন্তু তুমি থেকে যাবে অনন্তকাল শত শত মানুষের জীবন রক্ষার তাগিদে। তোমাকে সেলাম না করে পারলাম না।

নার্সিং পেশার গতিধারা

অতনু মেট্যা

স্টেট এডেড্ কলেজ টিচার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

"সেবাই পরম ধর্ম" —এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে জনস্বার্থে মুমূর্ষ্য মানুষের সেবায় ভগবানের কান্ডারী হিসেবে মনুষ্য রুপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, "The Lady with the Lamp". একজন সমাজ সংস্কারক, পরিসংখ্যানবিদ এবং আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়ে নাইটিংগেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সন্ন্যাসিনী সহকারীদের নিয়ে কনস্টান্টিনোপোলে আহত সৈনিকদের যত্নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ছিলেন উন্নতির দূত, যিনি স্বাস্থ্যবিধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করে মৃত্যুর হার কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাতের দুর্গম অন্ধকারও আটকে রাখতে পারিনি তার ল্যাম্পের আলোকে। কিন্তু সমালোচকদের কটাক্ষের মন্মুখীন হতে হয়েছিল এই মহীয়সীকে, অতিরঞ্জিত করা হয়েছে নারীদের সেবা কর্মকে। এই নারীরা ছিল অবহেলার পাত্রী, শোষণ, শাষন, নিপীড়ন এবং ভোগ্যবস্তু হওয়াই ছিল এদের জীবনের পরিণতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী শিক্ষার পাশাপাশি পর্দার আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে সেবা কর্মে নিযুক্ত হওয়া ছিল নিছকই অলৌকিক স্বপ্ন মাত্র, পাশাপাশি এই সেবিকাদের উপহার দেওয়া হত কটুক্তির বর্ষণ, চরিত্রহীনার উপমা, বেশ্যার পরিচয়।

"যতবার আলো জ্বালতে চাই
নিভে যায় বারে বারে,
আমার জীবনে তোমার আমন গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে, শুকায়েছে মুল
কুড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল।
আমার জীবনে তব মেবা তাই
বেদনার উপহারে"।

এত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেও সেই মেয়েরা তথা সেবিকারা যখন মায়ের মমতা বা ভগিনী স্নেহের আঁচল বাড়িয়ে দিয়েছে আর্তদের হিতের জন্য কিন্তু কখনোই তা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ সে যে নারী।

"আমার হাত বান্ধিবি,
পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে?
আমার চোখ বান্ধিবি, মুখ বান্ধিবি
পরান বান্ধিবি কেমনে"?

এই নারীরা এত বাধা মত্বেও কখনোই হাতে পায় শিকল পরে বমে থাকেনি, বন্দিনী হয়ে থাকেনি চার দেওয়ালের মধ্যে, নাইবা হয়েছে শুধু মন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র বিশেষ। কাদম্বিনী, নিবেদিতা, মাদার টেরেজা 'সহ প্রযুষ নবজাগরণের দূতের হাত ধরে সমাজে নারী পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার

স্বীকৃতি পায়। দেশের বিভিন্ন নারী আন্দোলন ও সংগঠনের মাধ্যমে নারী চেতনার প্রসার। ঘটে। মেয়েরা নিজেদের পছন্দের জীবন নির্বাহের সুযোগ পায়, সেবাকে পেশা হিসেবে জীবনের অংশ করতে পারে।

"জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

এই সুরে সুর মিলিয়ে মলিয়ে অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে মেয়েরা। সেভাবেই জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য করে জীবন ও নজীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।

ঘরে বাইরে সংসার সামলে নিজের প্রাণের পরোয়া না করে মহামারির কবল থেকে রক্ষা করেছে বহু প্রাণকে। রাতের পর রাত দুচোখের পাতা এক না করেও নিজের অসুস্থতাকে অবহেলা করেও বাঁচিয়েছে বহু প্রাণ। দিনের পর দিন নিজের বাবা-মা, সন্তানদের মুখ না দেখেও হাসিমুখে কত সন্তানকে সুস্থ করে তুলে দিয়েছে তাদের মায়ের কোলে। লে। এই সেবা শুধুমাত্র পেশাই নয় বরং মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপনের উত্তম মাধ্যম। বর্তমানে মেয়েরা। এই পেশায় নিযুক্ত হয়ে যে শুধুমাত্র রোগীর সেবা করেছে তাই নয় বরং তাদেরও মাবিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে।।ছ। এই পেশা নারীকে বানিয়েছে অবলা থেকে সবলা। এই পেশার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে কবির সেই চিরদৃষ্টি-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

মেয়েরা পেরেছে মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে দাসত্বের আভরনকে মুছে ফেলতে।

"মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী,
ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু,
ওড়াও সে আবরন"।

বাবা, দাদা, ভাইদেও সাথে পেরেছে সংসারের দায়ভার নিতে, পেরেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলতে। এই পেশার উন্নতির মাধ্যমে মানুষের জীবন থেকে কমে গেছে দুরারোগ্য রোগব্যাধি এবং সেবিকাদের হাত ধরেই সাধারণ মানুষ পেয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল ছোঁয়া। শিশু জন্মানো থেকে মায়ের পরিচর্যা জীবনের প্রতিটি ধাপে রোগ অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগীর জীবন সঞ্চয়ন করে মনুষ্য জীবনের প্রথম ও শেষ দিনের মাক্ষী হয় এই সেবিকারাই। শুধু তাই নয় কঠিন পরিস্থিতিতে রোগীর পরিবার পরিজনও আশ্বস্ত হয় এদেরই মানমিক সমর্থনে। এই পেশা এতটাই সুদুর প্রমারী যে শুধু মেবিকা নয়, ছেলেরাও নিযুক্ত হয়ে চলেছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ছোট কিংবা বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই চিত্র দৃশ্যমান। এই অদম্য জেদ এবং মাহসিকতাকে অবলম্বন করে আজ সমাজ যেভাবে এই পেশাকে তথা নারীকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাতে বলতে দ্বিধা নেই,

"নার্সিং এক মহান পেশা যা ছড়িয়ে পড়ুক গোটা বিশ্বমাঝে, সম্মান পাক প্রত্যেক নার্স, তাদের কৃত সকল কাজে"।

ওদের প্যারেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট

সাগ্নিক মন্ডল
SACT– প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

আমাদের একটা কথা 'কেয়ার করি না'। কিন্তু উনারা কেয়ার না করে থাকতে পারেন না। এই ধরুন এখনও যখন বলি বাবা মা এর কাছে কাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবো, একদম সন্ধ্যা হয়ে যাবে ফিরতে। তখন মা বা বাবা বলেন খেয়ে বেরোবি না।। আমার উত্তর না হলেই মা বলেন কেনো ভাতে ভাত খেয়ে বেরোলেই তো হয়। কোথাও কিছু জুটুক না জুটুক পেটে অন্তত দুটো ভাত থাকবে। আর আমার স্বাভাবিক উত্তর- 'ধুঃ ছাড়োতো ওসব'। এসব তো কিছু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বা আমরা মানুষ বলে একদিন বাবা দিবস বা মা দিবস পালন করে সেল্ফী তুলে সোস্যাল মিডিয়া তে ছাড়লেই তার ঋণ শোধ হয় না। এ এমন ব্যাঙ্ক যেখানে আমরা আজীবন ঋণ করতেই থাকি, করতেই থাকি। চিন্তা ভাবনা মননে এর কোনও সংজ্ঞা কোনোদিন ই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞান একে বলে প্যারেন্টাল কেয়ার ভালো বাঙলা করলে দাঁড়ায় অপত্য স্নেহ। আজ অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানের জন্য মাথা ও আবেগের জন্য মন দুটোরই রঙ মেলাতে বসবো। অর্থাৎ এই অপত্য স্নেহ কী, পিতৃ মাতৃ বিনিয়োগ ই বা কী এর পেছনে আবেগের তাড়না কতটা থাকে বা মস্তিষ্কের চিন্তনই বা কতটা থাকে!

তা অপত্য স্নেহ তবে কী? ওমা জানেন না! নামের মধ্যেই তো উত্তর লুকিয়ে। অপত্য কে স্নেহ করতে গেলে অপত্য কে তো আগে পৃথিবীর আলো দেখতেই হবে। অর্থাৎ অপত্য হবার পর বাবা মা সন্তানের ভালোর জন্য যা করে থাকেন। আরও গোড়া থেকে বলতে যতদিন জাইগোট তৈরি হলো, বাবার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু ফিউশনের পর প্রথম যে কোশ তৈরি হয় তখন থেকেই। কারন ঐ কোশ ই পরবর্তী কালে বিভাজনের পর বিভাজন হতে হতে পূর্ণাঙ্গ জীব তৈরি করবে। এর পর ঐ পূর্ণাঙ্গ জীব পৃথিবীর আলো চোখে দেখার পর যতদিন বাবা মা ওর যত্ন আত্তি করবে সেটাই অপত্য স্নেহ বা প্যারেন্টাল কেয়ার। তা শুধু মানুষই কী কেবল তার ছেলে মেয়ে কে ভালোবাসে! অন্য কেউ বাসে না! না । ভালোবাসায় তো যে কেউ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যখন তার মধ্যে মান এবং হুঁশ এর সৃষ্টি হয়।

এরপর আসি প্যারেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট। ভাবছেন মেয়ের বিয়ের জন্য লকার ভর্তি গয়না বা ছেলের ভবিষ্যতের জন্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কথা বলবো। না এ আর কতটুকু। আসল যখন পিতৃ-মাতৃ বিনিয়োগ এর গল্প শুনবেন তখন বলবেন এর সঙ্গে ঐ লকার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড কারোর ই তুলনা চলে না। হ্যাঁ, জীবজগতে এমনও হয়। কিন্তু সকলের চোখের সামনে মনের আড়ালে। আসলে ঐ রবিঠাকুরের কথা 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে' ।

ধরা যাক পাখি। যে দিন তার নিষেক হলো, ডিম তৈরি হলো তখন থেকে সে তার স্বামী, শুরু হলো প্যারেন্ট্যাল কেয়ার। কিন্তু বিনিয়োগ? বিনিয়োগ শুরু তার অনেক দিন আগে থেকে। আসলে প্যারেন্ট্যাল কেয়ার বিনিয়োগ বা প্যারেন্ট্যাল ইনভেস্টমেন্ট এর ই একটি অংশ। যে দিন ডিম পাড়লো, ডিমকে

সারাদিন দেখা, দেওয়া, অন্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচানো, এসব দুইয়ের মধ্যেই পড়ে, স্নেহ এবং বিনিয়োগ। তবু আপাত দৃষ্টিতে আমরা স্নেহ বলতে বুঝি জন্মের পরবর্তী সময় থেকেই। কিন্তু বিনিয়োগের গল্প শুরু তার অনেক অনেক আগে থেকে। কখন।। যখন সে ডিম পাড়েনি বা ডিম তৈরিই হয়নি তার ও প্রচুর প্রচুর দিন আগে থেকে। নেস্টিং। হ্যাঁ, বাসা তৈরি। বাসা তৈরি পাখির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। সবাই ভাবলেন আমরা বাড়ী তৈরি করি, পাখি বাসা করে এ আবার নতুন কী ।। কিন্তু বাসা বানানোর যে গপ্পো বা কেনো বাসা তৈরি তা শুনুন। আর এর পেছনে বিনিয়োগ কতটা তা দেখুন।

প্রথম বাসা কোথায় করবো, কোন গাছে করবো, সেখানে শত্রুর ভয় কতটা, খাদ্যের যোগান কি রকম, অর্থাৎ আমি না হলে দূরে গিয়ে খেয়ে এলাম। কিন্তু আমার বাচ্চারা তাদের জন্য নিয়ে এসে খাওয়াতে পারব কিনা, দূরে খাবার থাকলে সেটা আনতে সময় লাগবে এবং শক্তিও লাগবে , সেটা খিদের সময় মুখে খাবার তুলে দিতে পারব তো? যে যেটা খায় দানাশস্য আছে কিনা বা মাছ আছে কিনা বা পোকামাকড় আছে কিনা, বাতাসের গতি কি খুব বেশি হয়, হলেও কোন সময়টা হয়, কোন দিক থেকে আসে, যে গাছ বাছলো তাতে অন্য কোন শত্রু পাখি আছে কি? রোদ কি খুব বেশি লাগে? যদিও বা লাগে আমাদের সহ্য ক্ষমতা কতটা, বাচ্চাদের কষ্ট হবেনা তো, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কি হবে, আদ্রর্তা অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাস আক্রমণ হবে কিনা, তাতে ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে!! এরকম লাখো লাখো বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে তার সাইট সিলেকশন বা গাছ সিলেকশন। একটা জায়গায় অনেক গাছ আছে, কিন্তু কিভাবে একটা গাছে নজর পড়ে বা পাশাপাশি অনেক একই ধরনের গাছ তার মধ্যেও একটাকে বেছে নেয় বা কতক গুলোকে বেছে নেয় কতক গুলোকে বাদ দেয়। এ তবে বাসা তৈরির আগের ইনভেস্টমেন্ট। পুরো ডেটা সিট যেন রেডি এদের মস্তিষ্কে। শুধু কি এটুকুতেই সীমাবদ্ধ না। গাছ বা স্থান নির্বাচনের আগে আরো আরো অনেক গল্প। এদের সবসময়ই লাভ্ ম্যারেজ কিন্তু ভালোলাগা বা ভালোবাসা সবাই জানি মন থেকে হয়। কিন্তু এরা হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দুই কাজে লাগায় অর্থাৎ সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন কাকে প্রেমিক বা স্বামী বাছবে বা কাকে প্রেমিকা বা স্ত্রী বাছবে সে নিয়েও এদের ভয়ানক সময় এবং শক্তি বিনিয়োগ। আর এটাই আসল বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট এর সূচনা বিহেভিয়ার সাইন্স এর ভাষায় 'মেট সিলেকশন'। ধরি স্ত্রী পাখি কাকে স্বামী বাছবে, অবশ্যই যার পোটেনশিয়ালিটি বেশি । তার স্পার্ম এলে যে বাচ্চা হবে, সে জীবন যুদ্ধে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবে। সুতরাং আমার জিন পৃথিবীতে বিরাজ করবে। কিন্তু পুরুষ তার পোটেনশিয়ালিটি কিভাবে দেখাবে? সহজভাবে বলি কি করে তারা প্রেমিকাকে প্রপোজ করবে। সরকারি চাকরি, না ইম্প্রেট্র ক্যামেরা, না ব্র্যান্ডেড জামাকাপড় নাকি বাইক ! না এগুলো মেকি মানুষের হতে পারে । এদের না। এদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই দেখা যায় নৃত্য বা শারীরিক কিছু কসরত। আর ভালো বাসা তৈরির ক্ষমতা। যেমন ময়ূরী কাকে নির্বাচন করবে, ধরলাম পাঁচটা ময়ূর পেখম মিলল। হ্যাঁ, যে ময়ূরের পেছনে পালকে আইস্পট বেশি, অর্থাৎ কিনা তার পেখম বড়। পেখম বড় হলে সেই ময়ূরের বাধা বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং সে আর বাকিগুলোর থেকে শক্তিশালী। আলাদা। সুতরাং এ যদি আমার সঙ্গী হয়, তবে আমার সন্তানও এইরকম পোটেনশিয়ালিটি নিয়ে

জন্মাবে, এরকম ভাবেই নেট সিলেকশন হয় বেশিরভাগ প্রাণীদের । এতে বোঝাই যাচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রীদের দু ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছে। পুরুষরা শক্তি, বাহ্যিক বা শারীরিক কসরতের বিনিয়োগ আর স্ত্রীদের সাইকোলজিক্যাল বিনিয়োগ। কাকে বাছবো , কাকে না বলব আখো আখো জিনিস যাচাই করে দেখা হয়।

কারন যাকে আমি বেছে নেব সে যেন আমার বেস্ট পার্টনার হয়, তাহলে প্রথম ধাপ পার্টনারকে বেছে নেওয়া। তারপর সাইট সিলেকশন। কিন্তু পার্টনার নির্বাচনের পর কি সঙ্গে সঙ্গে জায়গা খুঁজে ঘর বাঁধা!! না । তাহলে ওদের আর বাপ-মা হতে হবে না, সাইট বা স্থান নির্বাচন অন্ততপক্ষে কমবেশি ১ বছর ধরে নেওয়া বিভিন্ন ফ্যাক্টরকে নিয়ে তথ্য সংগ্রহের পর। কারণ এখন দেখলাম এক জায়গার পরিবেশ এক, বর্ষার সময় কি এক থাকবে? শীতের সময় বা কি হবে ? মোটামুটি সবমিলিয়ে একটা প্রাথমিক জ্ঞান যতক্ষণ না হচ্ছে ওরা কিছুতেই বাসা তৈরি করা শুরু করবে না। আচ্ছা বাসা তৈরি হলো এরপর ডিম পাড়া একটা ইনভেস্টমেন্ট, তারপর ডিমের উপর বসা দেওয়া তাকে ঠিকমতো রাখা এবং সেবার সবই ইনভেস্টমেন্ট। তারপর বাচ্চা হলে তার যত্ন নেওয়া খাওয়ানো দাওয়ানো, তাদের শাসন করা, তাদের আদর করা সবই। তারপর আসে আর এক ইনভেস্টমেন্ট । সব জিনিস তো আর বাচ্চা জন্মসূত্রে পায় না। তাকে পড়াশোনা করানো, জীবন যুদ্ধ শেখানো, বাস্তবকে চেনানো যাকে আমরা বলি লার্নড বিহেভিয়ার। কিভাবে সোশ্যাল হতে হয়। কাকে সম্মান জানাতে হয়। কিভাবে উড়তে হয়। কিছুটা জন্মগত হয় কিন্তু বেশ কিছু আচরণ ওদেরও শিখতে হয়। শেখাতে হয়। এইরকম প্রচুর প্রচুর বিনিয়োগ করে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির বাপ মা। এরপর আসবে দ্বন্দ্ব । বিহেভিয়ার সায়েন্সের ভাষায় পেরেন্টস অকপ্রিং কনফ্লিক্ট। ভালোবাসার কাঙাল তো সবাই। তাই বাচ্চা চাইবে সব সময় বাবা-মা তাকে বইয়ের দিক ঘুম পাড়াক, গান শুনিয়ে চুল আঁচড়ে দিক, সব সময় চোখে হারাক। কিন্তু একটা সময়ের মধ্যকাঠি শেষ হলে তারা এই স্নেহ হাত বাচ্চার মাথার উপর থেকে তুলে নেবে। যা তোরা এবার যা। নিজের জীবন নিজে বুঝে নেই আর তোদের নিয়ে পারব না। কিন্তু তা সঙ্গে সঙ্গে বললে হয় নাকি? বাচ্চা চায় উল্টোটা, সে চায় স্নেহ। এরপর লাগবে ঝগড়াঝাঁটি।

কতদিন ইনভেস্ট করবে এর পেছনে আছে বিভিন্ন সায়েন্স স্টিমুলি বা উদ্দীপক। যা বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। এর মধ্যে ছন্দ রয়েছে। পুরো নাম ফিক্সড একশন প্যাটার্ন। যেমন হাই তোলা কাউকে কেউ শেখায় না। জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তেমনি এখানেও কত দিন বিনিয়োগ !! তার ও নিয়ন্ত্রণ জিন দ্বারা। বাচ্চা মা কে হাঁ খুলে দিচ্ছে মা খাওয়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাচ্চার মুখের ভেতর লাল দাগ, এই দাগ বাচ্চা যত বড় হবে তত ফিকে হতে থাকবে । একটা সময়ের পর রং তারতম্য দেখেই ও নিজের ছেলে বা মেয়েকে বলবে আর খাওয়াবো না । নিজের মাছের কাঁটা নিজে ছাড়া। নিজের চুল নিজে বাঁধ। নিজের কাজ সব নিজে কর। আর তোকে খাওয়াবো না এই রঙ দেখেই মায়ের উদ্দীপক গুলোর সুইচ অন বা সুইচ অফ হয়। এরপরও যদি ছেলে বা মেয়ে বলে, না আমাকে খাওয়াও, আমার চুল বেঁধে দাও, আমার মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে দাও, মা

করবে না আচ্ছা মা যদি করে ? বিপদ হবে? ঘোরতর বিপদ । কি এই বিপদ ? আচ্ছা তাহলে প্রথমে একটু ইনভেস্টমেন্ট এর হিসাব করে নিই। বাবা বা মায়ের বাসার সাইট সিলেকশনে প্রায় তিন মাস । আরো একমাস প্রায় বাসা তৈরিতে, ডিমে তা দিয়ে ইনকিউবেট করাতে প্রায় আরও ২১ থেকে ৩০ দিন। পাঁচ সাড়ে পাঁচ মাস কেটেই যায়। এরপরেও যদি কোন ছেলে বা মেয়ে চায় বাবা-মা আরো তাকে ওলে বাবালে.. মা..লে.. করুক, তাহলেই বিপদ। একচুয়ালি বিপদটা হল ওই বাচ্চাগুলোর পেছনে এনার্জি যদি আরও ইনভেস্ট হয় তবে পরের বছর আর সে মা-বাবা হতে পারবে না। কারণ পরের বছরের জন্য মা হতে গেলে ওর রেস্ট দরকার না হলে ওর শক্তি সঞ্চয় হবে না । শক্তি সঞ্চয় যদি না হয় তবে ওর নিজের শরীরের গ্রোথ হবে না। এ বিষয়ে আবারো আলোকপাত করি। গ্রোথ দু ধরনের। ভেজিটেটিভ বা দৈহিক গ্রোথ আর রিপ্রোডাক্টিভ বা প্রজননকালীন গ্রোথ। দৈহিক বৃদ্ধি হওয়ার পরে যদি বেশি এনার্জি হয় তবেই ওটা রিপ্রোডাকশনের জন্য ব্যবহৃত হবে। আর এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে কোন জীব সবথেকে বেশি শক্তি বা এনার্জি ক্ষয় করে তার প্রজননের সময় বা রিপ্রোডাকশনের সময়। তাহলে প্রজননকালীন এত এনার্জি না শরীরে জন্মালে সে একসঙ্গে খরচ করবে কিভাবে! তাই যদি এক মরশুমে বাচ্চার পেছনে যদি আরো আরো বিনিয়োগ করে তবে আর তার বিশ্রাম হবে না । ঠিকমতো ডায়েট হবে না । ফলে তার আর ভেজিটেটিভ গ্রোথ হবে না । আর ভেজিটেটিভ গ্রোথ না হলে সে রিপ্রোডাকশন হবেই বা কিভাবে। এইভাবে এরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং জেনারেশন প্ল্যানিং করে থাকে এবং পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হয় জিন দ্বারা।

সমাজের অবক্ষয়

শুভজিৎ প্রামানিক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

সমাজের অবক্ষয় একটি উদ্বেগজনক বিষয় যা বিশ্বের প্রায় বেশীর ভাগ অংশে পরিলক্ষিত করা যায়। এটি একটি সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বা অবনতিকে বোঝায়। এই অধঃপতন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় যেমন পারিবারিক কাঠামোর ভাঙ্গন, নৈতিক মান ক্ষয়, অপরাধ ও সহিংসতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সংহতির দুর্বলতা।

সামাজিক অবক্ষয়ের একটি প্রাথমিক কারন হল আমাদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধ ও কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, বিবাহবিচ্ছেদের হারবৃদ্ধি, একক পিতামাতার পরিবার এবং পিতামাতার অনুপস্থিতিতে শিশুরা খারাপ ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং তারা বিপথে পরিচালিত হয় যা সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে ।অস্থির বা অস্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যা আচরণগত সমস্যা এবং নৈতিক নির্দেশনার অভাবের দিকে পরিচালিত করে।

তদুপরি, নৈতিক মান ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের অবক্ষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখন ক্রমবর্ধমান বস্তুবাদী এবং ব্যক্তিবাদী বিশ্বে, সহানুভূতিশীলতা এবং সততা হ্রাস পেয়েছে। লোভ, লালসা, সততা এবং স্বার্থপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । দুর্নীতি, শোষণ এবং অন্যের কল্যাণের প্রতি অবজ্ঞা যা অবজ্ঞার সংস্কৃতির দিকে পরিচালিত করে। এই নৈতিক অবক্ষয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতাকে ক্ষুন্ন করে, সামষ্টিগতভাবে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।

অপরাধ, সহিংসতা এবং সম্পদের অপব্যবহারের বৃদ্ধি সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি প্রকাশ। দারিদ্র্য, অসমতা এবং সুযোগের অভাবের মতো কারণগুলি, অপরাধমূলক আচরণ এবং সামাজিক অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে। উপরন্তু, মাদকাসক্তি এবং সম্পদের অপব্যবহারের ব্যাপকতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে পরিবার ভেঙে যায়, স্বাস্থ্য সমস্যা হয় এবং সমাজের উপর অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাড়ায়।

তদুপরি, সামাজিক সংহতি এবং সম্প্রদায়ের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়া সমাজের অবক্ষয় ঘটায়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং সামাজিক মিডিয়া আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ককে রূপান্তরিত করেছে, যা প্রায়ই বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থপূর্ণ সংযোগের অভাবের দিকে পরিচালিত করে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিরা তাদের সম্প্রদায় থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে, যার ফলে নাগরিক ব্যস্ততা, স্বেচ্ছাসেবকতা এবং সহায়তা নেটওয়ার্কগুলি হ্রাস পায়।

সমাজের অবক্ষয় মোকাবেলা করার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করে। পারিবারিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা, নৈতিক শিক্ষার প্রচার এবং ছোটবেলা থেকেই নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সামাজিক ক্ষয় মোকাবিলায় অপরিহার্য।

উপরন্তু, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য মোকাবেলা করা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রদায়ের প্রতিপালন সামাজিক অবক্ষয়ের কারণগুলিকে প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে।

সমাজের অবক্ষয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল এবং স্থিতিশীলতার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এই ঘটনার মূল কারণগুলিকে মোকাবিলা করে এবং ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের প্রচারের মাধ্যমে, সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবণতাগুলিকে বিপরীতমুখী করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আরও সমন্বিত, সহানুভূতিশীল এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

হারায়ে খুঁজি

মৌসুমী হাজরা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

টুকরো টুকরো কতো ছবি আঁকা হয় এই জীবনে
কিছু চলে যায় স্মৃতির অন্তরালে, কিছু পড়ে মনে।
যা কিছু আজ ঝাপসা, হয়তো দৃশ্যমান হবে কোনো এক কালে
ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ ভরে ওঠে অশ্রুজলে।
মন-পাখিকে খাঁচায় রেখো না বন্দি করে
ডানা মেলে উড়তে দাও গো তারে,
যদিও জানে সে আসবে না ফিরে
তোমার ওই ভাঙা কুটিরের দ্বারে। হঠাৎ করে নীল আকাশে কতো না মেঘ জমে
ভিজিয়ে দিয়ে যায় বসুধাকে যদি একটু ব্যথা কমে, আপনমনে তাই সবার গেয়ে ওঠে প্রাণ
আবার হয়তো গাঁথা হবে কোনো জীবনমুখী গান।
বেলা শেষে সবাই ফেরে যে যার আপন নীড়ে
আমি শুধু বসে থাকি কাজলা নদীর তীরে,
দুকূল ছাপানো জলরাশি শুধু বলে যাই
এবার তবে ঘরে ফেরো আর তো দুঃখ নাই।
বাঁচার লড়াই করতে গিয়ে ভুলেছি আপনমন
জানি না এই তুচ্ছ জীবন, আর থাকবে কতক্ষণ।
আশায় আশায় তাই যে অপেক্ষায় থাকি
হয়তো কোনো একদিন ফিরবে সে পাখি।
ছোটোবেলার জোনাকিরা আর দেয় কি আলো
অন্ধকার রাতে তাদের দেখতে লাগত বেশ ভালো।
জীবনে কতকিছু হারিয়েছি তা কি বুঝি মনের
গহন বনে তাই আজ হারায়ে খুঁজি।

মাঙ্গলিক

পারমিতা আদক
৫ম সেমিস্টার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

বাংলার শব্দ ভান্ডারে উপস্থিত মাঙ্গলিক শব্দ বর্তমান সময়ে প্রায় অচলই বটে, তবে এখনের তুলনায় আগের সময় বেশ প্রচলিত ছিল এই শব্দ। কুসংস্কারে ভরা হিন্দু সমাজের একটি কুসংস্কার হল কোনো ব্যক্তির মঙ্গলদোষ থাকা। তৎকালীন সময়ে সেসব হিন্দু মানুষেরা মনে করতেন যে যেসব ব্যক্তির উপর মঙ্গল গ্রহের প্রভাব আছে, তার এই মঙ্গল দোষ দেখা যায়। যার দরুন তার বিবাহ জীবনে বিভিন্ন রকম সঙ্কট দেখা যায়, আর এই ব্যক্তিকেই মাঙ্গলিক বলা হয়ে থাকে। আর ঠিক বর্তমান সময়ে, পরিবেশের জীবনে মঙ্গলগ্রহ রূপি মানুষের প্রভাব পড়েছে যার দরুন বর্তমান পরিবেশ বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।

মানুষের মতো একটি পরিবেশের জীবন ও দীর্ঘশ্বাসে ভরা, যে পরিবেশ কিনা আমাদের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যায়। তাই আমাদের সকলের, প্রকৃতির মঙ্গল কামনা করা উচিত যে পরিবেশের জীবনের পথে যেন পূর্ণ হোক, যার জন্য আমরা পৃথিবীর আশীর্বাদে পরিশুদ্ধ বায়ু পেয়ে থাকি, যেখানে ওই পরিবেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গাছ, সূর্যের উজ্জ্বল কোমল আলো নিচে পান করে পাতার মাধ্যমে, আর সেই পাতার অকুরন্ত শক্তি ধরে রাখে যার ফলে কোন পাতা ভক্ষণকারী পতঙ্গ আবার সেই শক্তি পেয়ে থাকে যেটা প্রতি খাদ্য শৃংখলে প্রবেশ করতে থাকে। তাই আমাদের উচিত এই অকুরন্ত শক্তি ধারণকারী গাছকে শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির বক্ষে আহব্বান জানানো কারণ শ্রাবণের বৃষ্টির জল খুব উপযোগী ও কার্যকরী হয় যায়, যা একটি গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে,

কবি তাই গাছগুলিকে, আমাদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে বলেছেন, একদম বন্ধুর মতো সব সময় পাশে। এই কাজ আমাদের, সূর্যের উত্তপ্ত আলো থেকে বাঁচিয়ে ছায়া দিয়ে থাকে। পথের পাথরগুলিকে ঢেকে দেয় তার ফুল দিয়ে। যখন বসন্তের শুরুতে নতুন করে কুড়ি ফোটে আর নতুন ফল হওয়ার জন্য, সেগুলি ঝরে যায়, যার ফলে পথের পাথরগুলি ঢেকে যায়।

আমরা যে সুন্দর গায়ক পাখিদের আশ্রয় দেয়। আর প্রতিবছরের শুরুতে সন্ধ্যাবন্দনার গান ও অভিনন্দনের গন্ধ মিলায়ে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে যায় । তাইতো কবি বলছেন গাছগুলিকে যে বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে তবুও সবুজ গাছের প্রতি মানুষের ভালবাসা কম হবে না। আর প্রতি যুগের প্রতিটি মানুষ তোমার (গাছের) নিচে ছায়া নিয়ে নিতে ভুলবে না আর তুমি (গাছ) ফুলের গন্ধের মধ্যে সবাইকে নতুন বছরের আমন্ত্রণ জানাবে, যে নতুন বছরের সূচনা হবে, আর তোমার কুড়ি যেনো মৃতুহীন হয়।।

এক কথায় কবি বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃতির কাছে মঙ্গলগ্রহ রুপী মানুষের লোভ লালসার কাছ থেকে বাঁচাতে হবে, কারণ মানুষের লোভ কখনো শেষ হবে না, যা অনবরত বেড়ে চলছে আর চলবে। যার দরুন আগামী প্রজন্ম এক গাছহীন পরিবেশ পাবে এবং তৈরি হবে একটি সংকটময় পরিবেশ, কারণ এই গাছই একমাত্র সূর্যের আলোকে সঠিক কাজে লাগিয়ে সাহায্য করে থাকে আমাদের, কখনো খাদ্য প্রদান করে অথবা কখনো আমাদের ছায়া প্রদান করে। কিন্তু বর্তমান সমাজ কোনো কিছু পরোয়া না করে পরিবেশ ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই আমাদের সকলের উচিত বৃক্ষরোপণ করা ও প্রাকৃতিক সুন্দর সুফলম পরিবেশ বানিয়ে তোলা, হয়তো নিজের জন্য না হোক, আগামী প্রজন্মের জন্য।

সামুদ্রিক সিংহ

রচনা জানা
UG 1st SEM, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

সিংহ মামা সমুদ্রে গেলে হইচই এক কান্ড বাধত। তাই বলে কি সিংহ মামার সমুদ্রে যাওয়া নিষেধ। উনি সমুদ্রে থাকেন না তো কি হল.....এমন এক প্রানী আছে যে নাকি সিংহ মামার অমজ ভাই। তাঁর নাম হল পিনপিডস। যার বহিরাগত কানের ফ্ল্যাপ লম্বা। চওড়া বুক এবং সিংহ মামার মতোই গায়ে বড়ো বড়ো লোম Otariidae পরিবারের এই প্রানীটি একটিবিলুপ্ত প্রায় প্রানী।

প্রাপ্তবয়স্ক হলে এটি একটি গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে, তবে যৌবনে এটি কালো।প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সাধারণত প্রায় ৩০০ কিলোগ্রাম ওজন হয়, যা মহিলাদের ওজনের দ্বিগুন। তারা তাদের ঘাড়ের উপরে লাল- বাদামি পশমের এক ধরনের স্তর প্রদর্শন করে,এই কারণেই তাদের 'সামুদ্রিক সিংহ' বলা হয়। পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে তারা সুরক্ষার অধীনে এমন জায়গায় জন্ম দিতে যায় যেখানে হাজার হাজার নমুনা জড়ো হয়। এর জীবনকাল প্রায় ২৫ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে। সামুদ্রিক সিংহ একটি অত্যন্ত আঞ্চলিক প্রজাতি হিসেবে পরিচিত।

সামুদ্রিক সিংহ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে অনবহুল। প্রশান্ত মহাসাগরে এটি পেরু এবং চিলির উপকূলে অবস্থিত,গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে এবং মালপেলো এবং গোরগোনা দ্বীপপুঞ্জে।আটলান্টিক মহাসাগরে এটি উরুগুয়ের উপকূল থেকে এবং আর্জেন্টিনা সাগরের উপকূলে, আর্জেন্টিনার প্যাটাগোনিয়া মহাদেশীয় অংশের পাশাপাশি ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। এটি আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ সাগরেও পাওয়া যায়। পিনিপিডের তিনটি গ্রুপ সহ সামুদ্রিক সিংহের তাদের পরিবারে একাধিক প্রজনন পদ্ধতি এবং অভ্যাস রয়েছে তবে তারা তুলনামূলকভাবে সর্বজনীন থাকে। ওটারিডস , বা কানযুক্ত সামুদ্রিক সিংহ, তাদের বাচ্চা,সঙ্গীকে বড় করে তোলে এবং আরও পার্থিব জমি বা বরফের আবাসস্থলে বিশ্রাম নেয়। তাদের প্রাচুর্য এবং আউট- আউট আচরন তাদের জমি প্রজনন কার্যকলাপের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।তাদের রুকেরিগুলি নবজাত কুকুরের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা ওটারিডের সাথে বসবাস করে যা তাদের অঞ্চল রক্ষা করতে থাকে। প্রজননকালের শেষে পুরুষরা খাদ্য ও বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে পড়ে আর স্ত্রীরা থাকে লালন- পালনের জন্য। বছরের অন্যান্য বিন্দুতে বয়স এবং লিঙ্গের মিশ্রন থাকে রুকারিতে যা হাল- আউট প্যাটার্ন মাসিক পরিবর্তিত হয়।

এরা বিশ্বের মহাসাগর এবং সমুদ্রের একটি বৃহৎ অংশে বসবাস করে। যেখানে তারা মাছ,অক্টোপাস, স্কুইড,চিংড়ি এবং অন্যান্যদের মধ্যে খাবার খায়।

প্রকৃত সিংহের সাথে সামুদ্রিক সিংহের কোনো মিল নেই,যদিও উভয়ই শক্তিশালী যৌন দ্বিরূপতা সহ মাংসাশী। তাদের এই নামকরণের কারণ দুটি কারণে: তারা উচ্চস্বরে গর্জন করে। তাই সিংহমামা সমুদ্রে থাকতে না গেলেও সমুদ্রের সিংহমামা জলে নিজের এক ছোট্টো রাজ্য গড়ে তুলেছে।

ছাত্র সংসদ ছাত্র বন্ধু

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
B.A SGV 1st sem.

করোনার মতো মহামারীকে সঙ্গে নিয়ে ভর্তি হওয়া কলেজে। কলেজটার নাম 'মহিষাদল রাজ কলেজ'। ২০১৫ সাল স্কুলে এন.সি.সি জয়েন্ট করলাম। ক্যাম্প মহিষাদল রাজ কলেজ, এবং এই ক্যাম্পে যে.ডির মধ্যে আমি একাই যার রেঙ্ক আছে। ২০৭ নম্বর হল মহিষাদল রাজ কলেজ রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম কোনদিন কি এই এই কলেজে ভর্তি হতে পারবো না। কারন আমাদের কাছে কলেজে পড়া মানে অনেক কিছু কারণ আমরা ক্লাসে দশ বারো রোল করা ছেলে, তাই গাত্রে ব্যাথা হওয়াটা স্বাভাবিক।

কিন্তু না উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর কোন রকম প্রলোভনে পা না দিয়ে কারো ইচ্ছায় অন্য কোথাও না গিয়ে ছুটে সকল ডকুমেন্টস নিয়ে চলে গেলাম এবং মহিষাদল রাজ কলেজে ভর্তি হলাম। ভর্তি হওয়ার পর যা দেখলাম তাতে আমি খুশি ছিলাম না। একটা বড় ঘর যেখানে সব পার্টি করে। আপনি বলতে পারেন তুমিও তো ওই দলের সমর্থক আমি বলি হ্যাঁ কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি আমি তখন পছন্দ করতাম না। কারণ প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে তো তাই। যাইহোক করোনা চলতে থাকছে আমরাও বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করছি এবং অনলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছি পাসও করে যাচ্ছি ভুরি ভুরি নাম্বার পেয়ে। তবে আস্তে আস্তে সবুজ ঘরটাকে ভালো লাগতে শুরু করল কেন জানেন সবুজ ঘরের প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে আমরা যারা মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী তাদের শেষ বিন্দু দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কথন ভালোবাসতে বাসতে সবুজ ঘরটার একটা সদস্য হয়ে গেলাম আমিও। বিশ্বাস করুন এতদিন শুধু দেখতাম আর ভাবতাম ওদের কি পড়াশোনা নেই?ওরাও তো কলেজে পড়ে? ওরা পাস করে কি করে? কিন্তু সদস্য হওয়ার পর সবুজ ঘরের প্রত্যেককে এক কথায় ছাত্র সংসদকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। এতদিন আমি যা ভাবতাম পুরোটা ভুল ওই সবুজ ঘরের মধ্যে একজন দাদা দিদি নিজের জীবনের সর্বোচ্চ ডি.গ্রি টা অর্জন করে নিয়েছে। হাতের লেখা থেকে শুরু করে কথা বলা ধরন, কিভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার করতে হয় ওখান থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। আমি কে আমার মধ্যে কি আছে আমি কি পারবো তা হয়তো আমি মনে মনে বড়াই করে গেলাম কিন্তু প্রকৃত আমি কি পারি সেটা ছাত্র সংসদে প্রবেশ করার পর উপলব্ধি করতে পারলাম। দেখুন মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ ওইভাবে রাজনীতি করে না তারা সব দিক থেকে এগিয়ে।

ভাবলে অবাক লাগে এই ছাত্র সংসদ এক একটা ছাত্র বন্ধুকে তার জীবনের সর্বোচ্চ সুনাম এনে দিয়েছে। আমিও তার মধ্যে একজন। আমি জানিনা অন্যান্য কলেজ গুলোর ছাত্র সংসদের মধ্যে কভিড পরিস্থিতির পরবর্তীতে আর সংস্কৃতির মেল বন্ধন ধরে রাখতে পেরেছে কি না,কিন্তু মহিষাদল

রাজ কলেজ এর ছাত্র সংসদ সম্পূর্ণ আলাদা। পুরো বিশ্বে যখন করোনা মহামারী চলছে মানুষের দুটো খেতে পারছে না অসহায় মানুষগুলো টাকার অভাবে শীতে ঠান্ডার পোশাক পড়তে পারছে না। সেই অসহায় মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের ছেলে মেয়েরা এটা আমার নিজের চোখে দেখা। ভাবতে অবাক লাগে মহিষাদল রাজ কলেজে ছাত্র সংসদের ছেলে মেয়েরা প্রতি বছর ৩১শে ডিসেম্বরের রাতটা কাটায় আতশবাজি সহকারে নয় বরং অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর পাশে গিয়ে একসাথে হাতে হাত রেখে নতুন বছরকে উদযাপন করে। জানেন স্কুল জীবনে একবার মাত্র বিতর্ক সভা তাৎক্ষণিক বক্তব্য হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাই সেভাবে ওগুলো নিয়ে মাথাব্যথা আমার সেই রকম ছিল না। মহিষাদল রাজ কলেজে আসার পর ছাত্র সংসদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে দেখার পর এবং তাতে অংশগ্রহণ করে আমার জীবনে নতুন দরজা খুলে গেল। এই ছাত্র সংসদ বড় বড় মেলাতে কলেজের প্রতিযোগী হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছে এবং সেখানে আমি একটা বড় সুনাম অর্জন করেছি। এই ছাত্র সংসদ না হলে জেলা স্তর সহ উচ্চ সরকারি দপ্তর গুলোতে আমার প্রতিভার পরিস্ফুটন আমি করতে পারতাম না। আমাদের ছাত্র সংসদ প্রতি বছর আমাদের যে উপহার দেয় তা সবার থেকে আলাদা এটা প্রমাণিত সত্য এবং এটা নিয়ে আমরা ছাত্র বন্ধুরা এক প্রকার গর্ববোধ করি। আমরা গর্ববোধ করি এই ছাত্র সংসদের সহায়তায় আমরা আমাদের মহাবিদ্যালয়ের যে বোধমণ্ডলী রয়েছেন বা অধ্যাপক অধ্যাপিকা মন্ডলী রয়েছেন আমি যাদেরকে (গ্যালাক্সি) বলে থাকি তাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। সুযোগ পেয়েছি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা মন্ডলীদের কাছ থেকে জানার। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের খেলাধুলা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। স্যারেরা খেলবে? হ্যাঁ শিক্ষকরা ও খেলে! এবং তা মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ করে দেখিয়েছে!

আমাদের ছাত্র সংসদ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কোনো ছেলেমেয়েকে চোখ দেখিয়ে নয় নিজেদের বড়ো মন দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তাই হয়তো মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ আশপাশের অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের থেকে একেবারে

ভিন্ন ধরনের। আমি মনে করি আমাদের ছাত্র সংসদে হার একটা দাদা ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। প্রিয় কলেজটা কে কিভাবে নতুন করে সবদিক থেকে সাজিয়ে রাখা যায় তা রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ প্রতিনিয়ত ভেবে চলেছে। তাই ছাত্র সংসদের প্রত্যেক দাদা-দিদি, ভাই বোন প্রত্যেককে আমার সবুজ সেলাম!

মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ প্রমাণ করে দিয়েছে দাদাগিরি দেখিয়ে নয় বরং 'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে তার পাশে দাঁড়াও'।

হ্যাঁ মহিষাদল রাজ কলেজ আমি কতদিন বাঁচবো আমি তো জানিনা তবুও বলি 'তোমাকে চাই!' **প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মহিষাদল রাজ কলেজ তোমাকে চাই, তোমাকে চাই আমার ছাত্র সংসদ কে চাই। কেন? যখন সকলে সংস্কৃতিকে ও তার ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তৈরি করছে একটা নৈরাজ্য, যখন পুরো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বদলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে তখন একমাত্র**

মহিষাদল রাজ কলেজ ও তার ছাত্র সংসদ নতুন করে পুরনো দিনের সংস্কৃতি বা কালচার কে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ সমস্ত কালচারকে বা সংস্কৃতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয় কিছুটা তো কালের সাথে ভেসে যাবে তবুও বলি নাইবা পেলাম বিশকাপ আমরা তো টানা ১১ টা ম্যাচে জয়ী হয়েছি। ও ছাত্র সংসদ তোমাদের জন্য আমরা ছাত্র বন্ধুরা সত্যিই অনেক কিছু পেয়েছি। একেবারে অভিযোগ নেই বলবো না কিন্তু অভিযোগের খাতাতে একটা কলমও লিখতে পারবো না। প্রাণিবিদ শুভনয়বাবু বলেন- 'সত্যি হোক, মিথ্যে হোক এ বড়ো সুন্দর।' হ্যাঁ আমিও বলি সত্যিই মহিষাদল রাজ কলেজ ও তার ছাত্র সংসদ সত্যি সুন্দর, মহিষাদল রাজ কলেজের ও ছাত্র সংসদ আমি বলি- 'আমাদের রাজলক্ষ্মী'।

স্বাধীনতা-স্ব এর অধীনতা

অভিজিৎ মাইতিঃ

(স্বাধীনতা কথার অর্থ নিজের অধীন হওয়া। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলি-

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি"।

যদিও এটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা আমার বোধগম্য নেই, তবুও এ কথা বলার জন্য কোন দ্বিধা আমার মনে জন্ম নেয়নি। গত বুধবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তার পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে বলতে ইচ্ছে করে। কোনটা স্বাধীনতা? আবার বলি কোনটা স্বাধীনতা? অশ্লীল মুক্ত বর্বর শিক্ষা প্রদান করাটা স্বাধীনতা? আপনার ক্ষমতা আছে বলে বাবা হয়ে বসে থাকাটা স্বাধীনতা? এগুলো যদি স্বাধীনতাই হয় তাহলে হয়তো স্বেচ্ছাচারিতা আরো অনেক কিছু। তা আমার জানা নেই। তবে আমি বলি এ বছরের স্বাধীনতা দিবস সহ বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠান আমার মনে আনন্দ আনতে পারেনি। আমি ভালো নেই। যদি বলেন কেনো নেই? আমাদের এক ভাই উচ্চ শিক্ষার আঙিনাতে সুযোগ পেয়ে বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘুম তার ভাঙ্গেনি। এই ঘুম না ভাঙার পিছনে দায়ী 'বাবাদের স্বাধীনতা'। না না আমি জন্মদাতা পিতার কথা বলছি না। আমি বলছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অসৎভাবে রাজ করে যাওয়া নিজেকে হোস্টেলের বাবা বলে পরিচয় দেওয়া দাদা গুলোর কথা। আর যাই হোক এবারের স্বাধীনতা দিবস বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে আমি কোথাও 'শুভ' শব্দটা ব্যবহার করতে পারিনি। খারাপ লাগছে এটা ভেবে আমার মত কোন সিনিয়র দাদা দিদিরা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছোট ছোট ভাই বোনদের এখনো র‍্যাগিং করে চলছে। যাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলার ক্ষমতা স্বয়ং অধ্যক্ষ বা আচার্যের নেই। তাই এবারের স্বাধীনতা আমার কাছে অন্তত আনন্দের বিষয় নয় এবং পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলো আনন্দের হবে না। আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই তবে তা স্বাধীনতার নামে 'স্বেচ্ছাচারিতা' বা 'বর্বরতা' নয়।

আমরা চাই মুক্ত মনের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার দ্বারা মানুষের উপকার হবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে। যে স্বাধীনতার দ্বারা আমি এক বাক্যে স্বীকার করে নিতে পারব অন্য কোন জাতি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মানুষকে আমার নিজের ভাই বলে, গাইতে পারবো 'মোরা দুই সহোদর ভাই'। যারা বয়সের ছোট তাদেরকে চোখ দেখিয়ে নয় মন দেখিয়ে যাদেরকে আপন করে নিতে পারব যাতে তারাও পরবর্তী দিনে বাবা না বন্ধু হয়ে আরেক ছাত্র বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পারে। এমন স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল আমাদের। আমি জানিনা কি লাভ বিজ্ঞান পড়ে, কি লাভ সাহিত্য পড়ে, যে শিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহার করলাম সে শিক্ষার কোন দাম আমার কাছে নেই।

প্রায়শই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাররা বলেন- ছেলেমেয়েরা 'মনে থাকবে?' আমি বলি আমার মনে থাকবে। আপনাদের বলা শক্ত ভাষা গুলো যদি মনে নাও থাকে যাদবপুরের সেদিনের স্বাধীনতার কথা আমার আমৃত্যু কাল মনে থাকবে। প্রাণিবিদ শুভময় দাস মহাশয়, "আপনি বলেন পরের জন্মে

আমি কবি হব, আর বিজ্ঞান পড়বো না।" এমন ইচ্ছে আপনার মতো বহু অধ্যাপকের। আমার রক্তব্য হলো স্যার কবি হওয়ার পর আপনাদের কলমে এই বর্বর চাওয়া পাওয়ার স্বাধীনতা বা হোস্টেলের বাবাদের র‍্যাগিং এর কথা উঠে আসবে তো? আসবে তো অসহায় হাজার হাজার পুত্র হারা পিতার মাতার কান্নার শব্দ। যাদের পরিবার 'মদ' 'কিছু নেই, আবার বলি 'কিছুই নেই'। ছেলেকে পাঠিয়েছিল মদ বেচে দুধ কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য। নাকি শুধুই সুকুমার রায়ের 'ছাড়পত্র' রয়ে যাবে ক্লাস রুমের চার দেওয়ালে। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যদি আজ বেঁচে থাকতেন।

আমি জানি না কি করতেন স্বাধীন ভারতবর্ষের আজ এমন রুপ দেখার পর। না বুদ্ধিজীবী বেরিয়েছিলেন প্রতিবাদ করার জন্য তাদেরও টুটি টা চেপে ধরা হয়েছে, কে ধরেছে? এই স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রমাণিত অপরাধীর পক্ষেও যেদিন উকিল দাঁড়িয়েছে সে দিন থেকেই। কবিগুরু তার প্রার্থনা কবিতায় বলেছিলেন যে- ভারতবর্ষকে সেই স্বর্গে জাগরিত করো যেখানে মানুষ মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে, যেখানে চিত্ত অর্থাৎ মন ভয় শূন্য হবে। হ্যাঁ কবিগুরু। আমাদের ভারতবর্ষ সেই স্বর্গেই জাগরিত হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষের মাটিতে সিনিয়র, জুনিয়র, বড়, ছোট এইসব ভেদাভেদ করে স্বাধীনতার মত পবিত্র শব্দকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। আমি জানিনা এজন্যই কি কাজী নজরুল তারুণ্য শক্তির জয়গান গেয়েছিলেন? আজকের তরুণদের মধ্যে তো জীর্ণ পুঁথি কে ছুড়ে ফেলার মত কোন ঘটনা ঘটতে আমরা দেখছি না। যা হচ্ছে তা শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরা। এই জন্যই হয়তো স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলেছিলেন স্বাধীনতা তো এনে দেয়ায় যায়। কিন্তু তোমরা কি স্বাধীনতা রক্ষা করার মত যোগ্য হয়েছো?

হ্যাঁ স্বামীজি আমরা যোগ্য না হয়েও 'স্বাধীনতা' শব্দের অপব্যবহার করে 'বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই' সেজে সমাজে বিস্ময়ে ভ্রমি।।

সম্মোহন

অম্বিকা গুছাইত
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, এম.এস.সি.,
৪র্থ সেমিষ্টার

প্রেম নক্ষত্র,
এবং
ক্লান্তির আর কতগুলি বিন্দু তারা কে সরিয়ে
ফের জ্ঞানহীন লীন আত্মা জেগে ওঠে।
অন্তহীন সোনালি স্বপ্নের হাত ছাড়িয়ে
হেঁটে চলে কুসুম কোমল শিশির কণার ওপর দিয়ে
ভোরের ধুলোমাখা কুয়াশার গন্ধে।
চিন্তামগ্ন ব্যস্ততা ফেলে এসে ডুব দেয়,
কোলাহলের অঙ্গার থেকে অনেক দূরে
ধিক ধিক করে চলা অস্পষ্ট সময়ের স্পন্দন ধরে।
বিষন্ন পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়ে
পাড়ি দেয় যেন কোন অমৃতত্ব স্বর্গের উৎসে
নীরবতায় ঘেরা ঘোর সৌন্দর্যের পথে।
নীলিমার প্রান্তরে সাদা ফুলে ভরা ঘাসের ওপর
ছোট্ট একখানি ক্যানভাস সাজিয়ে
হাতে তুলে নেয় হৃদয় রাঙানো একটি মাত্র রং তুলি।
টান করা সেই তৃষ্ণার্ত তুলি ভরে ওঠে
ভ্রান্ত সূর্যের লাবণ্যে ভরা মঞ্জরি নিয়ে
অরূপ রাগের রূপের মোহে।
অর্চিত সকল মধুর আলোক বর্ষিত হয়
সাদা সেই নিরস রসে
নীল হলুদ মেঠো আকাশের রঙে।
অতি মুগ্ধ শান্ত বিস্মিত সে যেন কোন ছবি নয়
কোনো এক গভীর ঘোর
যা মিলিয়ে যায় প্রকৃতির কোলে।
নিমজ্জিত করে তার রূপের অন্তরে
আর ভরিয়ে তোলে সম্মোহিত দৃষ্টিতে
দিক সময় জ্ঞানহীন মাধুর্যে।
রাত ফুরিয়ে রাত আসে
সকল ব্যস্ততা পুনরায় নিশ্চল হয়
তবুও সে মগ্ন বিভরিত স্বপ্নে।
তার মনের সব ভাব রং মিশে একাকার হয়
তার ওই ক্ষুদ্র স্বপ্নে
যার কিঞ্চিতমাত্র ছোঁয়া এখন বাস্তবতায় হারা।
অদ্ভুত পৃথিবী মগ্ন ঘুম তাকে আকৃষ্ট করে
বাস্তব অবাস্তব একত্রিত হয়
আর,
গড়ে তোলে বিচিত্র সম্মোহন।

আমার কথা

নীলাদ্রী মন্ডল
(প্রাক্তন ছাত্র)

নষ্ট হওয়া চাঁদ যার নাম জীবন,
বাবা, মা, ভালোবাসা চায় চাকরি।
ভাই আর বোন চায় টাকা;
আমি কি চাই তা কেউ শোনেনি।
বয়স বাইস বছর হওয়ার পর
পূর্ণিমার চাঁদও ঝলসে যায়।
তখন আর নিজের জন্মদিনটাও;
মনে থাকে না, মনে থাকে না ভালো জামার কথাটা।
এখন বাবা বলে খোঁকা কারেন্ট এর বিলটা
মা বলে গ্যাসটা আনতে হবে।
বোন বলে কলেজ যাবো দাদা! টাকা,
আমি বলি সরকার একটা চাকরি।
সবাই সব চায়, সব পেয়েও যায়,
কিন্তু আমি চাকরিটা পাইনা,
কাউকে বোঝাতে পারিনি যে
সরকারটা আমার দাদা না।
একটা সময় চোখেণ ধল ধরেনা
যা ধরে তা আপন জনের ব্যথা মনে।
আবার ভাবি এসব ভাবনা কিন্তু
জীবন দুঃখ গুলোকে মনে রাখভে।

পৃথিবীটা হারিয়ে যাচ্ছে নীরবে

শুভেন্দু জানা
বি.এ. (ভূগোল), ১ম সেমিষ্টার

পৃথিবীটা হারিয়ে যাচ্ছে
ধীরে ধীরে নীরবে।
আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে
সমানে এই মর্তের গর্ভে।
চারিদিকে বাড়ছে দিনে দিনে
শুধুই তাপমাত্রা,
হিমালয়ের বরফ গলে
ভাসছে ধরিত্রী মাতা।
আগে যে মানে ছিল গাছ
সারি সারি দাঁড়িয়ে
আমরা দিয়েছি সেই স্থান
নানান তাল ভরিয়ে।
হে জনগণ।
তোমার তো আসার প্রদীপ,
কথাও এই বিশ্ব উষ্ণায়ণ!

কলেজ কিছু কথা

অর্কশাসমল
শরীরশিক্ষা বিভাগ, ৩য় বিভাগ

ফেলে আসা রাতে, কখনো চাই না হারাতে
আমাদের বিগত কলেজ জীবন
এক মুঠো হাসি সারাদিনের বদমাশি-প্রাণস্পন্দন
আজগুবি নাম রকমারি কাম
কারো দোষে কড়ে বদনাম
খাবারের ভাগে কারো ছোঁ সবেগে
আবার কেউ কম পেয়ে রাগে
রাজদিঘি পাঁড়ে একসাথে ঘোরা
তামাশার ফোয়ারা আর মশকরা
চা দোকান আর সুর জলধারে ঘেরা
আজও সেই স্বর্গরাজ্য আছে
নেই শুধু সেই পুরোনো ছেলের দল
যারা আজও স্মৃতি নিয়ে বাঁচে
সেই ঘরে ফেরার শেষ বাস
চেনা হাতেদের ছাড়াছাড়ি, আবেগের বাড়াবাড়ি
সন্দিহান প্রতিশ্রুতি স্বীকার্য, দেখা হবে তাড়াতাড়ি
হয়তো কিছু গল্পের সমাপ্তি এভাবেই সমিচীন
স্মৃতির রোমন্থনে দৃঢ় হয়ে বন্ধন প্রাচীন।
আবার দেখা হবে, জানিনা করে! তবু দেখা হবে নিক্ষর।

মেলা

সুমন পন্ডা
বি.কম (অনার্স), ৫ম সেমিষ্টার

মিছি মিছি খেলা করে,
গড়ে যায় বেলা।
শুধু সুর ভেসে আসে,
দূর সমুদ্রে বসেছে মেলা।।
শুনছে ওই বাসার পাখি,
শুনছে গোমুখ্য।
মেলা বুঝি আনন্দের খেলা,
হারিয়ে ফেলেছে দুঃখ।।
দেখছি কত লোক আসছে
নিয়ে একরাশ হাসি।
দেখছি তারা গুনগুনিয়ে,
বাজায় জোরে বাশি।।
মেঘের কোলে চাঁদ উঠেছে
সূর্য গেছে চলে
সন্ধ্যা যে আজ মধুর
মতো হাসছে মায়ের কোলে।।
কত আলো ঝিকি মিকি
হাট বাজারে মতো
কত এসে চাদের মেলা
আকাশের মেঘের মতো।।
চারিদিকে চিৎকার
কানফাটানো আওয়াজ
চারিদিকে বকের মতো
ছড়িয়েছে স্নিগ্ধ সাঁজ।

রজনীর আত্মকথা

বৃষ্টি মহাপাত্র
বি.এ., ১ম সেমিষ্টার

বনের মধ্যে তিব্র গন্ধ দিয়েছে সে ছড়িয়ে,
তারি সঙ্গে অনেক বন্ধু রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে,
আছে সেথায় গোলাপ, ডালিম মিলে মিশে এক থাকে
প্রজাপতি দিচ্ছে হানা ফুলের মধু খেতে।
গন্ধে ভরা সেই ফুলটি নাম রজনীগন্ধা
তাক ধিনাধিন তাকথ ধিনাধিন নাচছে সকাল সন্ধ্যা
হঠাৎ করে একদিন এক মানুষ এল বনে
দেখে মনে হয় মানুষটির কুবুদ্ধি মনে মনে
এগিয়ে এল সেই মানুষটি তুলে নিল আমায়,
ওমা সেই লোকটিকে বল না কে থামায়।
নিয়ে গেল সে আমাকে খুব সুন্দর বাড়িতে
গুজে দিল সে আমাকে ওই ফুলেরই সারিতে।
দেখলাম আমি খুব লোকজন চলাচল করে,
বুকটা আমার থর থর ভয়েই গেলাম মরে।
রাতটা আমি ছিলাম ওভাবেই সেখানে
আমার সঙ্গি সাথী সবাই ছিল যেখানে।
সকাল হতে না হতে ওরা ফেলে দিল আমায়।
ছোট্ট ছোট্ট শিশু আমাকে পায়ে ফেলে মাড়ায়।
চলে সবার সময় আমার কোনো বন্ধুর দেখা মেলে না
এত কষ্ট এত দুঃখ দেখে এদের একটুকুও কি মায়া হল না।

ARUNDHATI VIRMANI

SOVANA DANDAPAT
M.Sc.(ZOOLOGY),1st. Semister

Arundhati Vismani was born in New Aelhi, on 26 June 1957. She did her schooling from Lady Irwin School and Convent Went of of Jerus Jesus and. graduated with a Selhi. Sher in history from Inobre a degorce in porastha College, As a Student of of Delhi University, She University, Sh abtained a french fellowship in 1981 to prepare her Ph. A. a thesis in French history at. in French history at the Sorbonne in faries. Under ther Dupervision of Maurice Agulhon, forofessor at at the Catteger de France, She studied the politicization of French sural Baciely af der the Restoration and before the institution of male Universal Suppojager under the Second Republic in 1848. She defended her thesis in September 1984. In 1991, She married Jean Boustics and moved to France. She studied Odissi dancer with Madhave Mudgal.

She began her teaching career at Jesus and Mary College and later tadght at Delhi Une and Mary College a was head of ght The History Bedion ans the Section I where she of then of the School of Correspondence Courses, of participatest in adult colucation and Lo Long-Sirstance teaching. Then header in European History at the History Separtment, the taught modern Frenchand European History. In Marseille She taught at Marseille Busi ness School and Ecole des Hautes Etudes en Sciencar Saciales. Since then, her research focused sed on the in India, erpecially the 20th Cont analyst of the abound Aparador ans colonial period wrys She is also an mations of Indian Beciety. Her recent work facuses on the idea of the dead a unifadon civil code en India. She presented her work at. Aute Study of Commonwealth a conferencer at th Studies (School of University of London) on The Institute Advanced on 23 November 2023.

Published several looks and many papors in collective workers and scientific jowonals (in England, France and Italy);. has lectured She has on Colonidt Indian ? history history in different Universitier and academic institutibor (Paris, Ithaca (USA), London, Berlin, Balogna, Florence, New Delhi, New York, Aron Arbor..... She is a research fellow at the Center Narbert Elias in Marseille.

Virmani has been engaged in consultancy work, Specializing in training 2000. She is a recognized export for the "Ange Since 2000. ion pour le progrès du Management, She as ation sted in an Corporate Social Responsibility Indian perspective Intou- Korporabilbility (CSR) fromA National Flag for India, Resduate, Nationalism and ther folidier of Sentiment, about which canicher Khushwant Singh wnale: She has done mek culous sesearch on the subject and fut. what ay appear at feast Sight may a book on Indian history". anol put life ento ara footnote in Viamani Specially hesearch interestp- History of Colonial and post and post colonial India.

শঙ্খচিল

মোনালিসা মন্ডল
UG 1st semister

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে , এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙখচিল শালিকের বেশে..."

কবির কবিতায়, গানের লাইনে শঙ্খচিল আমাদের ঘরের পাখি

শঙ্খচিল এর বিজ্ঞাসম্মত নাম *Haliastur indus* নাম জানলাম পরিবার জানি চলুন। এরা অ্যাক্সিপিট্রিডি পরিবারের সদস্য। এদের দৈর্ঘ্য ৭৬-৮৪ সেমি। বাড়ির ঠিকানা সে বলছি শুনুন। নদী - নালা,জলাশয়ের আশেপাশে এদের দেখা যায় বেশি। গায়ের রঙ শঙ্খের মতো ধপধোপে সাদা । এদের মাথা, ঘাড়, বুক, পেটের তলার পালক গুলোর ওপর মরিচা ধরা খাড়া ছোটো রেখা থাকে। এদের ঠোঁট ছোটো,লেজ সবসময় গোলাকার ডগাযুক্ত হয়। ডানার রং লাল হয়। সর রং বাদামি এবং দেহের নীচের দিক বহুরেখা সংবলিত। এদের লেজ ও ডানা দুটি ও শরীরের অন্যান্য অংশ খয়েরী হয়।

উচ্চতা। এদের আকার প্রায় ৩০-৭০সেমি। আর এদের ওজন সে আপনার আমার মতো এতো বেশি নয়। ১২০-১৭৫০ গ্রাম হয়। ওজন টা খুব একটা বেশী নয় ! তাই না বলুন!

জীবনে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের তো প্রয়োজন। তাই না। খাদ্য জীবনে বেঁচে থাকার এক গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান। শঙ্খচিল রা মাছ এবং জলজ প্রাণী গুলো কে ধরে ধরে খেয়ে জীবন ধারন করে। কিন্তু প্রিয় খাদ্য বলে তো একটা ব্যাপার আছে। ছোটো সাপ, হাঁস -মুরগির বাচ্চা এদের প্রিয় খাদ্য।

থাকা ,খাওয়া, দেখতে শুনতে সব ই তো হলো।ডিসেম্বর - এপ্রিল মাসে শঙ্খচিল এর প্রজনন ঋতু । দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়াতে আগস্ট - অক্টোবর ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে এপ্রিল - জুন। এরা উচুঁ স্থানে বাসা বাঁধে, যা মুলত ছোট ছোট ডাল ও শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি হয়। একই বাসা এরা বছরের পর বছর ধরে ব্যাবহার করে। শঙ্খচিল তার প্রজনন ঋতু তে মাত্র দুটি করে ডিম দেয়। মা - বাবা দুজনে মিলেই বাচ্চা বড়ো করে।ঠিক মানুষ দের মত। যদিও ডিমে তা দেয় শুধু মা পাখি। ডিম পাড়ার ২৬-২৯ দিনের মধ্যে এদের ডিম ফুটে ছোট ছোট বাচ্চা বের হয়। ডিম পাড়লো,ছোট বাচ্চা ও বের হলো। তারপর ছানারা বড় হলো। বড়ো হতে সময় লাগে ওই ধরুন ৪০-৫৬ দিন। এই কয়েক দিনের ভেতরেই পাখিরা উড়তে পারে এবং দুই বছর বয়সে একটি শঙ্খচিল পাখি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে। এই পাখির আয়ুস্কাল মাত্র ১১-১২ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এই মহাজাগতিক পাখিরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। যেমন ধরুন উত্তর আমেরিকা,দক্ষিণ আমেরিকা , ক্যারিবীয়, ব্রাজিল, পেরু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।।

প্রিয়জন

রিয়া দেবনাথ
পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

সব আশা আমার জীবনের নীড়ে
জানিনা জীবনে আসবে কেউ
কষ্টে বাসা বেঁধেছে এ মনে
মন ভাঙ্গা আবেগের ঢেউ
আপন মনে মুগ্ধ হয়ে
আপন মনও আজ হইলো পর।
আমার আবেগের সূচনা কভু
আগের মতো নেয়না খবর
আমার মনেরও সুজন হলে
প্রথম দেখে হয়েছি মুগ্ধ,
আজীবন দিলে পীড়িত বিদায়
তোকে ঠাঁই দিয়ে হয়েছে অন্তরে দগ্ধ।
দুঃগ্ধ বেদনা সবারই আছে,
আছে যাওয়া আর আসার পালা।
শেষ আরতি বন্দি বানিয়ে
আমার স্বপ্নের প্রিয়জন
রজনী আমার ডুবে গেছে
তবুও কাছে টানে আমার মন।

আজকের সমাজ

সঙ্গম দাস
কর্মশিক্ষা, ৫ম সেমিষ্টার

সময় আজও বয়ে চলেছে
কিন্তু নেই সে ভালোবাসা,
শহরের ওই বাবু সাহেব
কোনদিন হয় না চাষা।
ভাগ্যের চাকা ঘুরে চলে
সময় হয়নি দাঁড়াবার
সমাজ বিরোধী নেমে পড়েছে
শুরু হয়েছে নানা কারবার।
আজকে মানুষ গরুর পালে
ভীড় করে চলেছে
সম্পত্তি পাওয়ার লোভে
খুনোখুনি করে মরছে।
থাকে না মেয়েদের আব্রু
বাজারে বিক্রি হয়ে যায়
হতভাগা, নিরন্ন, দরিদ্র মানুষ
কুকুরের সঙ্গে খাবার খায়।
বাবা-মা দেখে অনেক স্বপ্ন
বৃদ্ধ বয়সে সুখে থাকতে
আপন মানুষ ঘৃণার ছলে
দেয়নি তাদের বাঁচতে।
মা আজ সন্তান হারা
রক্ত ভেজা মাঠি,
মানুষকে চেনা দায়
কে সঠিক খাঁটি।
আজকের সমাজ তাই এক
বিষাক্ত নরকের কীট
মানুষ হয়ে গেছে
এক মন পোড়া ইট।

র‍্যাগিং

ছন্দা সামন্ত
বাংলা অনার্স, ১ম সেমিষ্টার

পড়াশুনোর প্রতি আমার প্রথম থেকেই ইচ্ছে
তাইতো আমি ভালো কলেজ বেছেছিলাম পড়তে।
ইচ্ছে ছিল করব কিছু পড়াশুনোর পরে।
বাবা মায়ের কাছে আমি শপথ গ্রহণ করি,
পড়াশুনো করেই আমি করব চাকরি-বাকরি।

প্রথম প্রথম লাগল আমার কলেজটাকেই বাড়ি,
পরে আমি ভাবতে থাকি এটাই কী কলেজ বাড়ি!
কিছু দিন পরে আমার শুরু হল র‍্যাগিং
সেই র‍্যাগিং-এ ওরা আমায় করল মারামারি,
ওরাই আমায় মেরে দিল ছাদ থেকে ফেলে,
এখন সেটা লুকোতে বলছে ওরা আত্মঘাতী।
তাহলে কী মা কোনো দিনও হবে না আমার বিচার
এই অপবাদ নিয়েই আমি চলব চিরকাল।
কিছু দিন ধরে চারিদিকে হবে আমার নাম
খবরের কাগজে প্রথম পাতায় থাকবে
আমার শিরোনাম।
তারপরে মা তোমায় ওরা বলবে কিছু বলতে-
মিছিল হবে ধর্মঘট হবে, হবে আরো কত কী?
কিছুদিন পরে আমার হয়ে যবে সব স্তব্ধ
তার পরে সেই টাকা দিয়ে করা হবে মুখবন্ধ।
সব শেষে কী হেরে গেল তোমার আমার স্বপ্ন?

শিক্ষক দিবস

সুদীপ্তা দাস
ইতিহাস অনার্স, ৫ম সেমিষ্টার

শিক্ষক দিবস মানে নতুন অধ্যায়ের সূচনা
পুরানো যুগের অবসান।
শিক্ষক দিবস মানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে
আরও একটু ভালোবাসার টান।
শিক্ষক দিবস মানে পড়াশোনা বন্ধ
থাকেনা পিঠে বইয়ের বোঝা।
শিক্ষক দিবস মানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের
লুক্কায়িত রহস্য খোঁজা।
শিক্ষক দিবস মানে নয় কো দামী উপহার
নয় বিপুল আয়োজন,
শিক্ষক দিবস মানে শিক্ষার্থীর সামান্য উপহারেই
আহ্লাদে আটখানা শিক্ষকের মন।
শিক্ষক দিবস মানে নতুন অনুভূতি
এক নতুনত্বের ছোঁয়া,
শিক্ষক দিবস মানে শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ
কাটিয়ে ভীতির ধোঁয়া।
জন্মে ছিলেন মনীষী এক, এই ভারতের ঘরে
মানুষজন জানতেন তাঁরে, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলে।
পালন করি শিক্ষক দিবস, তাঁরই জন্ম দিনে,
সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি, ভক্তি-শ্রদ্ধা মেনে।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া

সায়নী প্রধান

আকি কোনোদিন ভাবিনি যে আমার জীবনে এত বড় সুযোগ আসবে, বিগত বছরের আমার সাথে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা এই ভাবে তুলে ধরতে পারব 'অমিত্রাক্ষর' পত্রিকার মাধ্যমে এর জন্য আমি মহিষাদল রাজ কলেজের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

২০২৩, একটি মানুষের জীবন তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন সুখ-দুঃখ দুটোই তার জীবনে আসে। মানে মানব জীবন হল সুখ-দুঃখের মিথোস্ক্রিয়া। আমরা জীবনে সুখের কাহিনী কতোই না শুনেছি বই পড়ে, পত্রিকার মাধ্যমে কিছু দুঃখের স্মৃতি সবাই প্রকাশ করতে পারে না সঠিক ভাবে। তাই কিছু ব্যক্তির দুঃখের কথা অন্তরেই থেকে যায়। আজ আমার বলার তেমন কিছু নেই কিন্তু জীবনে এক অদ্ভুত সফলতা যা দুঃখের মাধ্যমে সফলিত হয়েছে। সেই কথাই আজ আমি জানাব আমার লিখনের মাধ্যমে। আমরা বাবা মানেই জানি—

"বাবা, মস্ত মানব তুমি,
অনুভূতি গুলো প্রকাশ্যে মানা।
দুটো অক্ষরে সীমাহীন
ভালোবাসার জগৎ;
অকিঞ্চিৎ অবান্তর আবদারের
তুমি তো সেই ঠিকানা।"

তার মানে বাবা ছাড়া আমরা সবাই অচল, কিন্তু আমার জীবনে সেই দেবতুল্য মানুষটি বিগত বছরে এতোটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, ভাবিনি বাবাকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব। কিন্তু মনে বিশ্বাস রেখেছিলাম যে, যদি আমার ধৈর্য আর বাবাকে সুস্থ করে তোলার সংকল্প সঠিক হয়ে থাকে তবে আমি পারব বাবাকে সুস্থ করে তুলতে আর পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। কেননা আমি পরিবারের বড়ো ময়ে। আমারই দায়িত্ব পরিবারকে দেখে শুনে রাখা। অনেকে কষ্ট পেয়ে ভেঙে পড়ে মানসিক ভাবে কিন্তু আমি সেই সময়ে শক্ত হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর কঠিন তপস্যার ফল আমি পেয়েছি বাবকে সুস্থ করে তুলতে পারে। আমি তেমন জীবনে কিছু কষ্ট পেয়েছি তেমনি পেয়েছি আনন্দ যা আমার জীবনকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এই ঘটনাই হল আমার জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনা।

এগারোর বাংলা

মৌমিতা মাহাত

রবি ঠাকুর লিখেগেছেন
'গুরু' নাটকটি।
আবার লিখেছেন 'কর্তার ভূত'
গল্প যে একটি।
'সুয়েজ খালে হাজার শিকার'
লেখেন বিবেকানন্দ।
এটি একটি মজার
খুব ভালো প্রবন্ধ।
'নুন' কবিতা লিখেগেছেন
জয় গোস্বামী
তিনিও আবার কম নইকো
বিরাট তাঁর নামী।
মধুসূদন দত্ত তিনিও যে খুব
সকলের বড়ো চেনা।
অতি সুন্দর কবিতা তাঁর
'নীলধ্বজের প্রতি জনা'।
'বাড়ির কাছে আরশিনগর'
আজও জনপ্রিয়।
এর জন্য লালন ফকির
সবার স্মরণীয়।

সারমর্ম

প্রশান্ত বেরা

শূন্যতা একদিন পূর্ণতা পাবে এটা ঠিক
কিন্তু তা যেনো সব কিছুতেই পায়।
আজকের ভুলগুলো পরেরবার ঠিক হবেই
কিন্তু তা যেন ঈর্ষা বা সমালোচনা না হয়।
গতকালের যা নর্মদা, আজ তা রুপনারায়ণ
পরিবর্তন তো ঈশ্বরের দান, যা চিরন্তন সত্য।
যারা কাছে আছে, তারা থাকুক কাছে
যদি সত্যি সে আপন হয় তাহলে রয়ে যাবে।
আর যারা ভুলবো না বলে যাচ্ছে সব সময়
ভবিষ্যতে তারা মনে থাকা স্মৃতি বলতে পারবেনা।
সবকিছু নিয়ে চলছি আমি, চলতে হবে অসীমে
তবে যা পাচ্ছি তা শোধ করা মুশকিল হবে একদিন।
এ জীবনে অনেক দাদা, ভাই, বোনকে দেখেছি
কিন্তু আমার মত বাকি ছয়জনকে আজও দেখিনি।
চলতে থাকবে বেলা, সংকট হবে অনেক কিছুর
তবে এই অনেক কিছু যে কি তা বলতে পারবো না।
স্মৃতির তালিকা বোর্ডে নামটা রয়ে যাবে
বছরের ভারে আমার নামে প্রাক্তন এসে যাবে।
একদিন আড়ালে যে আমাকে বলবে ভালো-মন্দ
হয়তো একদিন তার সাথে আমার মেলেনি ছন্দ।
ছন্দ মিললেও সে যে অলংকার হবে তা বলছি না
কারণ সব অলংকার লেখার সময় কলমে বসে না।
কাউকে বোঝার শক্তি আর মানুষ চেনা এটা ক্ষমতা
কিন্তু কাউকে মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া এটা পার্থক্য।
হয়তো আমি আর আমার কথা অনেকের কাছে ব্রাত্য
যাদের বোঝার শক্তি নেই তারাও কিন্তু একদিকে ব্রাত্য।
অনেকে বলবে অনেক; বলুক অন্ধকারে
আমি বলি রুটি কিনে খাওয়ার খরচটা অনেক।
পাওয়ার থেকে সকলের না পাওয়াটা অনেক আছে
পাওয়ার কথাটা কিন্তু কেউ বলে না, রেখেদেয় গোপনে।
সবার মত একই কথা আমিও যে ভাবি
ওটা খারাপ আমারটা ভালো, আমি কি করে বলি।।

স্বরচিত কবিতা

প্রেম

নয়না প্রামানিক
(স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম)

প্রেম মানে বসন্ত,
প্রেম মানে বেঁচে থাকা।
প্রেম মানে হাজার তারার,
একটি সন্ধ্যাতারা।।
পাহাড়ের কোলে, সোনালী-রূপোর ঝলকানী,
শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর, ফড়িং এর নৃত্যখানী।
সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈল,
যেন এক হীরের টুকরো।।
এক শিল্পীর প্রেম, তাঁর শিল্পের প্রতি।
এক মায়ের প্রেম, তাঁর সন্তানের প্রতি।
এক পাখির প্রেম, তাঁর গাছের প্রতি।
এক ধার্মিকের প্রেম, তাঁর ধর্মের প্রতি।

বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করে,
যেদিন বাঁচিয়ে ছিল হাজার গাছ,
সাঁওতালরা গড়ে ছিল এক নতুন সমাজ,
আজও গাওয়া হয় সেই প্রেম কথা।।

ইতিহাসের পাতায় যখন দেখি,
হাজারো মানুষের রক্তের দাগ,
হিংস্র-নেকড়ের মতো কেড়ে নিয়েছিল নির্মম প্রাণ।
বলি হয়েছিল হাজার-হাজার সতেজ প্রাণ।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে,
যখন মৃত্যু হয় হাজার-হাজার সৈনিক।
খালি হয় হাজারো মায়ের কোল,
চির জাগ্রত থাক তাঁদের নাম।।

প্রেম মানে চিরন্তর,
প্রেম মানে সত্য,
প্রেম মানে হাজার শব্দের
এক অদ্বিতীয় শব্দ।।

প্রেম

দিশা কর
(স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়)

প্রেম ঠিক কাকে বলে জানো?
প্রেমিক মানে কী?
বাসলাম ভালো এই ধরিত্রীরে
প্রেমিক হলাম কী?
আচ্ছা ধরো ওই স্থানটার
শিক্ষক হওয়ার এইম,
বলবে না কেউ বিষয়টিতে
আছে ছোঁড়াটার প্রেম?
ওই যে জওয়ান ছোটে যুদ্ধে
আসল দেশপ্রেমী,
শত শত প্রাণ করে বলিদান
হল কি সে প্রেম-ই?
ওই যে ছেলেটির পাখিতে ব্যস্ত
পড়াশোনায় দিয়ে ফাঁকি?
বুড়ো ময়নাতেই মজেছে তার মন
আচ্ছা এটা প্রেম হল না নাকি?
ফুটবলের নেশায় মত্ত-ছেলেটা
খেলতে যায় রোজ বিকেলে,
আচ্ছা এটাই কি যথেষ্ট নয়
প্রেম করতে গেলে?
ছোট্টো ক্ষুদিরাম স্বাধীনের আশায়
চলে গেল দিয়ে ফাঁকি,
দেশভক্তি শেখালো সবারে
আচ্ছা এটা প্রেম হল না নাকি?
প্রেম বলতে কী শুধুই
ওসবেতেই হয়?
কেউ কি মোরে বোঝাবে গো
প্রেম কাহারে কয়?
প্রেম হোক স্বপ্ন, কবিতায়
প্রেম সঙ্গীত হয়েই বাজুক,
প্রেমের সজ্জা তোমার আমার
প্রেমটা শুধুই বাঁচুক।

প্রেম

সুমন মাইতি
(স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় তৃতীয়)

প্রেম শব্দটি দুটি অক্ষরের বাঁধনে বাঁধা
যদি হারিয়ে যেতে পারো,
খুঁজে পাবে গোলক ধাঁধা।
প্রেমের পরিভাষা বুঝতে যদি পারো
'আমি তোমায় ভালোবাসি' বলার সময়
বিবেক জাগবে তোমারো।
প্রেম সেটা নয় যেথা লুকিয়ে আছে বিকার
প্রেম সেটা যেটা ভালোবাসায় দেবে
পূর্ণতার আকার।
প্রেম সেটা নয় যেথা লুকিয়ে আছে
সুপ্ত চাওয়া পাওয়া
প্রেম সেটাই যেথা বইবে বিরহের হাওয়া।
প্রেম বলতে যদি বোঝ শুধু ছেলেতে আর মেয়েতে
তাহলে বলবো তুমি ভুল কারণ এই সংসার
চলে ঐ প্রেমেরই শক্তিতে।
সন্তানের প্রবল কষ্টে মায়ের স্নেহ মায়া
সব বিপদে সন্তানের নিরাপদ আশ্রয় ঐ
মায়ের আঁচল ছায়া।
মায়ের সন্তান প্রেম আর সন্তানের মাতৃপ্রেম
প্রেমের অনন্য আধার
এ প্রেম অস্বীকার করে সাধ্যি আছে কার?
প্রেমের সম্পর্ক এই জড় দেহের নয়
এক মনের সাথে আর এক মনের
মেলবন্ধনে হয়।
প্রেম অবিনাশী, প্রেমের হয়না কখনো শেষ
প্রেমের ছোঁয়ায় ভালোবাসা পায়
পূর্ণতার স্নিগ্ধ 'বেশ'।
ভালোবাসা তো হতে পারে ধূলোকণার সাথেও
প্রেমতো সহজে হয় না, যদি খুঁজতে পারো
খুঁজে পাবে মৃত্যুতেও।
প্রেম তো পরম সুন্দর, সৃষ্টিই তার ফল
মৃত্যু রূপে পরমা সুন্দরী
ধ্বংসই তার বল।
প্রেম তো পারে আটকাতে মৃত্যুর
ভীষণ তোপ
মৃত্যুর কাছে অসাধ্য ভাঙ্গা
প্রেমময়তার ধোপ।
গরীবও পরম ধনী, যদি থাকে
প্রেমের ধারা
ধনীও পরম নিঃস্ব,
কী হবে শুধু টাকার দ্বারা?
প্রেমের আবেশে মুর্ছিত হও
প্রেম যে অবিনাশী
প্রেম ছাড়া প্রকৃত সুখ উধাও
সব লাগবে গলার ফাঁসি।

অনুগল্প

'কুসংস্কার'

দেবজিৎ সরকার
(অনুগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম)

— "স্বপ্ন"

"না, বাবা, না পারব, না বাবা চাচা, ও ভাইজান বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই, অ মা-হা হা হা"। না তুলে দিলে আমায় স্বামীর চিতায়। তপ্ত আগুন আঁচে, ঝলসে যেতে থাকল আমার ছোট্ট দেহ, অল্পের জীবন। বাজনার গমগমে আওয়াজ চাপা দিয়ে দিচ্ছিল আমার আর্তনাদ। বাঁচার শেষ ভরসা আওয়াজটাকে।

স্বামীর বয়স হয়েছিল ৮০ -র গোড়ায়। আর আমার সবে ১৪। বিয়ে করা আমার মজবুরি ছিল। কিন্তু এ অলুক্ষুণে মৃত্যু! বুড়োটা তেমন খারাপ ও ছিল না। তবে এভাবে তার ভালোবাসার নিদাদ খুলে দিতে হবে? মরে - এ?

"আঃ - মাঃ মাগোও," তপ্ত আগুন, স্বামীর চিতায় আমার হাড়ে হাড়ে যেন অস্তিত্ব মেটানোর চেষ্টায়, কী যন্ত্রণা! আঃ আঃ,"

উঃ হ্ হ্ হ্ ! বাব্বা - হ, কী ভীষণ স্বপ্ন ছিল রে।

উফ্, অমা, মা আ আ —

— কীরে সোনা, এমন ধড়াফড়িয়ে উঠে পড়লি যে বড়! দাঁড়া জল আনছি।

— "কী ভাগ্যে 'রাজাজী' রামমোহন রায় 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধ করেছিল, না হলে আজ আমার স্বপ্ন বাস্তব হয়ে যেত।

— ঠিকই রে সোনা, সব স্বপ্ন সত্যি হতে নেই।

'কুসংস্কার'

দিশা কর

(অনুগল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়)

সেদিন ছিল মেঘলার গণিত পরীক্ষা। সকাল থেকে অঙ্ক — করেই চলেছে। বেলা ১১ টায় ওর পরীক্ষা। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে ১০.৪৫ এর মধ্যেই ওকে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। মেঘলা তাই মাকে বললো - "মা গো, আমার খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও"। মেঘলার মা তখন তাকে বললো "ঘরে আসন পেতে বোস আমি তোর খাওয়ার নিয়ে আসছি।" এই বলে কড়াইতে ডিম সেদ্ধ করতে দিয়ে তার মা খাওয়ার দিতে গেলেন। মেঘলা যথারীতি তার খাওয়ারটা খেতে শুরু করে। এমন সময় পাশের বাড়ির কাকিমা মেঘলার মা কে তাদের বাড়িতে একটু আসার কথা বলেন। মেঘলার মা ও রান্না চাপিয়ে তাদের বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। মেঘলা তার খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে তার এঁটো থালাটা রাখতে গিয়ে বলে, মা আজ কী রান্না করেছে দেখি। এই বলে কড়াইয়ের ওপরের ঢাকনাটা সরায়। এমন সময় তার মা সেখানে হাজির হয়। মেঘলাকে কড়াইয়ের ঢাকনা খুলতে দেখে তার মা বলে ওঠেন - "ব্যাস ডিমটা দেখেই ফেললি তো! এবার দেখবি অঙ্কে শূন্য পাওয়া থেকে তোকে কেউ আটকাতে পারবে না"। মেঘলা তাঁর মায়ের কথা শুনে থমকে গেল এবং কোনো কথার জবাব না দিয়েই প্রস্তুত হয়ে পরীক্ষা দিতে স্কুলে চলে যায়। পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে সে তার মাকে বলে যে বাকি পাঁচটা বিষয়ের পরীক্ষাগুলোর থেকে আজকের অঙ্ক পরীক্ষাটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে তার। মা - কে বলে ওসব 'কুসংস্কার'। কে বলেছে ডিম দেখে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খারাপ হবে? সবকিছুর পেছনেই একটা বিজ্ঞান কাজ করে। পৃথিবীতে 'কুসংস্কার' বলে কোনো শব্দ নেই। যা আছে তা কেবল অন্ধবিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত তা না হলে বিজ্ঞান ও ভুল বলে বিবেচিত হবে।

'কুসংস্কার'

সোমা রাণী মাইতি
(অনুগল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয়)

দিশা ও তার বাবা তারা যাবে ইরানে। সেখানে বড়ো বড়ো মন্দিরে তীর্থযাত্রা করবে। হঠাৎ পথে দেখতে পেল একজন মহিলা রাস্তার পাশে পড়ে আছে। "বাবা। ও বাবা দেখো ওখানে কেউ একজন পড়ে আছে"।

একজন বলছে, ওই বুড়ির গায়ে কেউ হাত দিও না। কোন ধর্মের মানুষ তাঁর ঠিক নেই।

বুড়ি চিৎকার করতে করতে বলল, "ওই বুড়িকে কেউ বাঁচারও যে আমার সঙ্গী। "ও তো মানুষ।"

কেউ একজন বলে উঠল ও মুসলিম ওর গায়ে কেউ হাত দিও না। আর একজন বলল ন না ও 'হিন্দু'। ওর গায়ে হাত দিলে আমাদের আল্লা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না। ওর গায়ে হাত দিলে আমাদের ধর্মের প্রতি নিন্দা করা হবে।

এই নিয়ে রাস্তার মধ্যে তুমুল ঝামেলা বাঁধতে থাকে।

একজন ব্রাহ্মণ এসে বলল "ওই বুড়ির গায়ে কেউ হাত দিলে তাকে ধর্ম থেকে বিতাড়িত করা হবে। আমাদের সমাজে ধর্ম নিয়েই এখনো নানা কুসংস্কার রয়েছে। বুড়ির গায়ে হাত দিলে আমাদের জাত চলে যাবে।

তাই ভয়ে কেউ বুড়ির গায়ে হাত দিল না। ওই বুঝি তাদের ধর্মে দাগ লাগবে।

হঠাৎ দিশার বাবা রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল। দেখল বুড়ি 'আধমরা' হয়ে পড়ে আছে। তারপাশে আর এক বুড়ি তার দেহটাকে জড়িয়ে ধরে বসে বসে কাঁধছে।

হঠাৎ একজন করুণ স্বরে বলে উঠল —

" তোমরা ঈশ্বরের 'সর্বোত্তম সৃষ্টি,'
তোমরা মানুষ।"

প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে একই শিক্ষা দেয়। সবাইকে একি পথে চালিত করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তো একই রক্ত বইছে। আল্লা, ভগবান সবাই এক। সবার শিক্ষা একই ভাবধারায় তৈরি। সবাই আমাদের একটাই শিক্ষা দেয় মানুষের পাশে দাঁড়াও। ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে দাও।

সবাই তাদের ভুল বুঝতে পারল। তারা কুসংস্কারের ভাবধারা থেকে যখন বেরোল। সবাই একসাথে বুড়িকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে এল।

কিন্তু এখন বুড়ি আর বাঁচল না। হয়তো বুড়ি বেঁচে যেত —

"যদি না কুসংস্কারের বেড়াজাল থাকত।"

স্বরচিত গল্প

মুক্তমনা

'এ বন্ধুত্ব প্রাণময়'

সুমন মাইতি (স্বরচিত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম)

কেউ চেনো তারে? নামটি তাহার বড়ই মিঠে প্রাঞ্জল তুমি ভাবছ হয়ত সে মানুষ। কিন্তু তা তো নয় সে হল একটি পায়রা। যে তার নিজস্ব ইচ্ছায় উড়ে যায় আকাশের এই প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কখনোও বা বেরিয়ে আসে ওই দিগন্তহীন আকাশের বুক চিরে। তার হারা বলছি চিনো রেখো দুধ সাদা রঙের এক গিরিবাহ পায়রা। তাছাড়াও তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। তার একটি পায়ের কোনো আঙুল নেই। হয়ত কোনো লম্পট ছেলের ফাঁদে নয়ত কোনো মানুষের বাড়িতে লক্ষ্য চুরি করে খাওয়ার জন্য এই পরিণতি তার। আর অপর দিকে পাড়ার সব থেকে বাউন্ডুলে ছেলেটার নাম শ্বেতাগ্নী। বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, ফুটফুটে ফরসা গায়ের রং। দেখো বাপ মা বড় সাধ করে নাম রেখেছিল শ্বেতাগ্নী। পড়াশুনায় যার এক টুকুও মন নেই। সময় পেলেই বেরিয়ে পড়ে আকাশের বুকে উড়িয়ে দিতে তার খেলনা সন্তান একটি ঘুড়ি। তার নাম রেখেছে মুক্তা। এযেন 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। যাইহোক শ্বেতাগ্নী সারাদিন বেরিয়ে যায় ঘুড়ি নিয়ে। ওদিকে প্রাঞ্জন বড্ড একা। একাই উড়ে বেড়ায়। একদিন প্রাঞ্জন উড়ছে কি জানি কিসের এত তাড়া তার বড্ড গতিতেই। হঠাৎ সে গিয়ে ধাক্কা মারে উড়তে থাকা শ্বেতাগ্নীর প্রাণের 'মুক্তা' কে। মুক্তা চেচিয়ে উঠল "কেরে চোখের মাথা খেয়েছিল নাকি?"। প্রাঞ্জন উত্তর দেয় না। ভাই! আজ বড্ড তাড়া। দেখতে পাইনি। তা কোথায় এত চললো? মুক্ত ব্যথায় চিৎকার করে বলে। প্রাঞ্জন জানায় পাশের পাড়ায় দাদাদের ধান রোদে দিয়েছে। তিনদিন কিছুই খাইনি। এই বলে সময় নষ্ট না করে প্রাঞ্জন এগিয়ে চলে। গিয়ে যথারিতি ধান খেয়ে ফিরে আসার পথে তার চোখে পড়ে মুক্তো এখনও আকাশে।

প্রাঞ্জন বলে কি ভাই এখনো উড়ছো? আমায় দেখো আমি খেয়ে ফিরছি। বড় তৃপ্তি পেলাম আজ। মুক্তা কাতর কণ্ঠে বলে তুমি তো মুক্ত। তোমার কোনো বাঁধন নেই। উড়ে চলো আপন ছন্দে। আর আমায় দেখো কতটা অসহায়, কতটা ক্লান্ত, কতটা পরিশ্রান্ত।

গত সপ্তাহে আমায় কিনে আনে শ্বেতাগ্নি। তারপর থেকে কোনো বিরাম নেই আমার। প্রাঞ্জন বলে তবে তোমার থেকে বড় অসহায় আমি। আমার কোনোদিন আধপেটা তো কোনোদিন অনাহারেই কাটাতে হয়। আজ অনেকদিন পর কিছুটা তৃপ্তি করে খেলাম। বিদায়। — এই বলে প্রাঞ্জন চলে গেল। কিন্তু তার মন বারেবারেই মুক্তার কথা ভাসছিল। কত কষ্ট বেচারার। পরের দিন সে যায় গিয়ে দেখে মুক্তা আকাশে। আবার শুরু কথা বার্তা। প্রাঞ্জন তো নতুন বন্ধু পেয়ে খুব খুশি। যাইহোক একজনকে পাওয়া গেল তো কথা বলার জন্য মুক্তাও দারুণ খুশি। এভাবেই দিনের পর দিন এগিয়ে চলে তাদের বন্ধুত্ব। প্রাঞ্জন রোজ

আসে। আর মুক্তা সে তো বন্দি অবস্থাতেই অপেক্ষা করে খোলা আকাশে তার ওই প্রাণজ্জল বন্ধুটির।

এদিকে এসে গেল বিশ্বকর্মা পুজো। দেবপক্ষের ইতির দিন। আর পাড়া সেজে উঠেছে উৎসবে। আজ যে ঘুড়ির প্রতিযোগীতা। শ্বেতাগ্নী বড্ড উৎসাহে প্রাণের মুক্তোকে নিয়ে অংশ নেয় সেই উৎসবে। মুক্তা ভেবে বেরোয় আজ হয় সে মুক্ত হবে খোলা আকাশে নচেৎ আর ফিরবে না। বুকের কাঁপকাঠি ছিঁড়ে ভেসে যাবে অটই সাগরে। ঢাক - ঢোল সহযোগে শুরু হল প্রতিযোগীতা। আর এদিকে প্রাঞ্জনও এসেছে তার বন্ধুর জয়যাত্রায় শামিল হতে। মুক্তা কখনো লাট খেয়ে ওপরে উঠছে আবার কখনো গোঁত মেরে নেমে আসার ভঙ্গিতে কেটে ফেলাচ্ছে অজস্র ঘুড়ির সুতো। শ্বেতাগ্নী ভাবছে আজ বোধ করি মুক্তা জিতিয়ে দেবে তারে। দেখতে দেখতে মুক্তো কেটে ফেলছে একের পর এক ঘুড়ি। কিন্তু তার মন চাইছে যে সে যেন ছিঁড়ে যায়।

এভাবেই সব ঘুড়ির পালা শেষ আকাশে কেবল মুক্তা আর অন্যদিকে সতুদের ঘুড়ি পর্না। মহানন্দে প্রাঞ্জন উপভোগ করছে তার বন্ধুর কীর্তি। মুক্তো একবারভাবে প্রাঞ্জনকে কি সব বলবে যদি সে সাহায্য করে কিছু। পরে বনের না এদিকে টান পড়েছে মুক্তার সুতোয় সেভাবে এই বুলি জিতে যাবে সে। আর যদি সে যেতে তবে নতুন করে শহর তার আবার বিরহের জীবনযন্ত্রণা। শ্বেতাগ্নীর অত্যাচার নাকি ভালোবাসা? সে অত সব বোঝে না সে কেবলই চায় একটু মুক্তির স্বাদ পেতে।

এদিকে প্রাঞ্জন বুঝি আন্দাজ করল বন্ধুর কষ্টটা। সে ভাবতে পারছে না সে কি করতে হঠাৎ সে তিরবেগে ছুটে যায় মুক্তার দিকে। টুকরে ছিঁড়ে দেয় মুক্তার সুতো এবং মুক্তার বুক থেকে যে সুতো বেরিয়েছে তা জড়িয়ে নেয় নিজের ওই আঙুলহীন পাটাতে। শ্বেতাগ্নী কান্নায় ভেঙে পড়ে কারণ তার স্বপ্ন সে প্রাঞ্জন ভেঙে দিয়েছে। বিপরীত দলের বাজনা তার কানে বড়ই গঞ্জনা লাগছিল। সে আর পারছে না। আসলে সত্যিই কি প্রাঞ্জন হারিয়ে দিল বন্ধুকে? না সে বন্ধুর স্বপ্নপূরণ করল। আর হারজিত ওসব অতীত কারণ বিপরীত দল যে জিতেও আনন্দ পাচ্ছে না কারণ তারা বুঝে গেছে ওরা হারনি। জিতে গেছে ওদের বন্ধুত্ব। সবাই নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে গেল। আর এদিকে মুক্তাকে আর পায় কে সে যে মুক্ত আজ আর সাথে তার প্রানসখা। আপন মনে উড়ে গেল ওই বন্ধু। ওরা উপলব্দি করছে মুক্তির স্বাদ অমৃতও অপেক্ষা মিঠে।

মুক্তমনা

"মা"

বিজয় দাস (স্বরচিত গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়)

"দেখছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা" — পাশের বেডে অ্যাডমিট কোনো ব্যক্তির ফোনে বাজছে। আর আমরা চোখ গড়িয়ে না মানা জলধারা বইছে। মনে পড়ছে আমার ছেলেকে নিয়ে দেখা কত স্বপ্ন। আমি, আমার স্বামী ও আমার ছেলে অবণী। বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে আর আমার স্বামীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। স্বপ্ন দেখতাম ছেলেকে নিয়ে 'ও' বহো হবে, চাকরি করবে আমাদের সুন্দর বাড়ি হবে আর জানো তখন ছেলের কথা শুনেই বুকটা জুড়িয়ে যেত। ছেলে বলত মা-বাবা তোমাদের আমি রাজা-রাণীর মতো রাখব। শুধু একবার বড়ো হতে দাও। আমি বড়ো চাকরি করব তোমাদের আর অভাব হবে না। হ্যাঁ, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, মুখে রক্ত ওঠা পরিশ্রমের টাকায় ছেলেকে পড়িয়েছি। ছেলে অনেক বড়ো হলো, আর অনেক বড়ো কোম্পানীতে চাকরি পেলো। ছেলে বিয়েও করল। ছেলে বলেছিলো মা তোমাকে রাণী করে রাখব। হ্যাঁ রেখেছিল তবে 'চাকরাণী'। নতুন বাড়িও হলো তবে যে বাড়িতে জায়গা হয়নি আমারও আমার স্বামীর। আমাদের জায়গা হলো ছেলের গোয়াল ঘরে। তবে সেখানে এখন গোরু থাকে না। থাকি আমরা প্রচন্ড শীতে। আমার স্বামী আর থাকলেন না। আমায় ছেড়ে মুক্ত হয়ে গেলেন সবকিছু থেকে। তারপর ঐ গোয়াল ঘরেও আমার জায়গা হলো না। ছেলে বললো ঐ গোয়াল ভেঙ্গে ওখানে গাড়ি রাখার জন্য ছোট্ট ঘর হবে। আমার জায়গা হলো রাস্তায়। পেটের জ্বালা অনেক বড়ো জ্বালা — সবকিছু মানলেও ঐ পেট মানে না। মনে আছে সেইদিন আমি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার তুলতেও দ্বিধা বোধ করলাম না। পরের দিন এক জলের কারখানাতে কাজ নিলাম। ওখানে থেকেই কেটে যাচ্ছিল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও ওই বছর বাইশ - তেইশ ছেলেটার সাথে কাজ করতাম। সবাই আমাকে খুবই ভালোবেসেছিলো হয়তো নিজের ছেলেও কখনো এমনভাবে ভালোবাসেনি। ওরা যখন ওদের টিফিন থেকে তুলে আমার মুখে দিয়ে বলতো ঠাকুমা তুমি আগে খাবে তারপর আমরা খাব তখন চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়তো আর মনে হতো আমার ছেলে যার জ্বর হলে না খেয়ে না নিজের কথা ভেবে রাতের পর রাত প্রার্থণা করতাম আর সেবা করতাম যার মুখে না খাবার তুলে কখনো খেতাম না, সেই ছেলেই আমার মুখে খাবার তুলে দেয়নি। চাকরাণীর মতো কাজ করেছি কিন্তু কখনো দুটো ভাতও যত্ন করে দেয়নি। অনাহারে, শীতে আমার স্বামী গত হলেন। হঠাৎ মোহভঙ্গ হলো নার্স মেয়েটির কথায়, ও আমাকে ঔষধ দিতে এসেছে।

এই দু'দিন আগে রাস্তা থেকে কিছু ছেলে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। তিনদিন আগে আমি যখন জল ডেলিভারি করতে যাই আমার ছেলের বাড়ি থেকে দুই-তিন বাড়ি দূরে বলতে গেলে আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে শুনলাম আমার ছেলের দুটো কিডনি নষ্ট তাই হয়তো সে বাঁচবে না সে কোথাও কোন বড়ো নার্সিং হোমে ভর্তি। টাকা লাগবে ৬ লক্ষের মতো। জমি বাড়ি সব নাকি বন্দক গেছে চিকিৎসা

করাতে। এখন আর টাকাও নেই তাদের কিডনি ট্রান্সফার করার জন্যে, কিডনি কেনার জন্য। তাই শুনে আমি ছুটলাম হাসপাতালে অঙ্গদানের জন্য। আমার দুটো কিডনি দান করে যে টাকা পেলাম তা দিয়ে এলাম ছেলের বাড়ির উঠোনে। আর আমি কিছু না বলেই চলে গেলাম। আমার ছেলে সুস্থ হোক। এই প্রার্থনাই করতে থাকলাম। একদিন বেশ ভালোই কাটল। তারপর থেকে মাথা ঘোরানো শুরু হলো। তারপরই রাস্তায় চলতে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলাম। আমি যে কিডনি বিক্রি করে দিয়েছি তা কাউকে জানাইনি। এখন, আমার ঠিকানা হয়েছে হাসপাতালে।

হ্যাঁ ঐ যে গানটা শুনেছিলাম "দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা" — আমার ছেলেকে আমি হয়তো সঠিক শিক্ষা দিতে পারিনি তাই তার "সোনারূপী" বা তার থেকেও দামী মনুষ্যত্বটা কাঁচাই রয়ে গেছে। হঠাৎ যেন পায়ে করোও ঠান্ডা হাতের ছোঁয়া, এ ছোঁয়া আমার ভীষণ চেনা, চোখ খুলে দেখি আমার "অবণী"। আমার বুকটা যেন ধড়াশ করে উঠলো ওর মুখে মা ডাক শুনে। ওর চোখের জল আমার মতোই বাঁধ ভেঙ্গেছে। আমার পাটা ধৈতি করে বলছে মা তুমি নিজের কিডনি বিক্রি করলে আর অদৃশ্যের সেই কিডটি তোমার এই কুলাঙ্গার ছেলেকে বাঁচালো "মা" কিন্তু এই বাঁচার কি মানে মা? আমি আমার ভুল বুঝেছি, আর তোমার দেওয়া টাকাটা সেটাও জানতে পেরেছি। 'মা' ..... মাগো ..... তুমি তোমার সবটা দিয়ে গেলে সারাজীবন আর এখনও নিজেকে উজাড় করে দিলে "মা"। আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি নি মা। বাবার কাছেও আমি অপরাধী। তুমি সুস্থ হয়ে উঠো মা আমি অমার সব ভুলে-র মাশুল দেওয়ার চেষ্টা করবো। না এটা মাশুল না এটা সেবার থেকে বড়ো কিছুই হবে না "মা"। তোমার সেবা করবো আর তোমার মাধ্যমে বাবার প্রতি করা অন্যায়ের প্রায়ঃশ্চিত্ত করবো মা। মা তুমি সুস্থ হয়ে আমাদের সাথে ফিরে চলো "মা"।

তোমাকে রাণীর মতো করে রাখব ..... হঠাৎ, দেখি নার্স মেয়েটা ডাক্তার ডাকতে ছুটলো, ডাক্তার এসে আমার বুকে স্টোথোস্কোপটা রেখে পাশের রাখা চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার সাথে কাজ করা ছেলেগুলো যারা প্রতিদিন দেখে যেত। ছুটতে ছুটতে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আর কেঁদে কেঁদে বলছে আমাদের একা করে চলে গেলে .....

বুঝলাম আমার মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ আমর ঐ দেহটার মৃত্যু হয়েছে। আমার দেখা ঝাপসা আশাগুলো তবে আমার "স্বপ্নই" বলতে পারি আমার কল্পনা ছিল।

হয়তো আমার ছেলে আমার পারলৌকিক কাজ করবে, লোক খাওয়াবে। যে তার বাবা-মাকেই দুমুঠো দিতে পারল না। সে হয়তো বা মুক্ত মনে খাওয়াবে, দান করবে।

সে বাবা-মা তাদের সবকিছু দিয়ে গেলেন, সব সুখ ত্যাগ করলেন তাদের থেকে বড়ো 'মুক্তমনা' আর কেই বা হতে পারে. পৃথিবীতে ভগবানরূপী এই বাবা-মার থেকে মুক্তমনা কী সৃষ্টিকর্তা হতে পারে??

মুক্তমনা

"যদি আকাশে উড়তে পারতাম"

সোমা রাণী মাইতি (স্বরচিত গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয়)

আমি যদি আকাশে উড়তে পারতাম কতই না ভালো হত। যেখানে ইচ্ছে হতো যেতাম, যা ইচ্ছে করতে পারতাম।

কেন? অভি দাদা। তুমি চাইলেই তো যেতে পার ..... অনেক দূর দূরান্তে।

আমি চাইলেই কী আর যেতে পারি রে।

কেন তুমি যেতে পার না?

ও থাক। সে কথা, অনেক কথা।

বল না। দাদা। বল?

হঠাৎ ট্রেনের পাশ দিয়ে চলে গেল এক ফেরিওয়ালা। স্টেশনে ট্রেন থামতেই চাওয়ালা এসে বলছে চা নেবে ..... চা ...

হঠাৎ ট্রেনটা আবার পী ..... পী ..... শব্দ করতে করতে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

দাদাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। তোমার কেন আকাশে উড়তে ইচ্ছে করে।

দাদা হঠাৎ বলতে বলতে গা থেকে চাদরটা সরাতেই দেখতে পেলাম দাদার দুটো পা নেই।

আমি দেখে অবাক হোয়ে গেলাম। আমি বাকহারা হয়ে গেলাম।

আমি বললাম — "কী করে এসব হল দাদা।"

দাদা বলতে থাকে ও এক দুঃস্বপ্নের মতো। আমার বয়স তখন দশ বছর। আমি গিয়েছিলাম কলকাতা। সেখানে "ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' ছিল। জিতার পর ফিরে আসার পথে হঠাৎ এক এক্সিডেন্টে পা দুটো চলে যায়। আমি একমাস ভর্ত্তি ছিলাম হাসপাতালে। আমি চেয়েছিলাম বড়ো ক্রিকেটার হতে। আমার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। আমি চেয়েছিলাম মাথা উঁচু করে বাঁচার। জীবনে তো তিনটি মূল মন্ত্রঃ — ইচ্ছা, বিশ্বাস, আশাবাদী।

'ইচ্ছা' যার দ্বারা মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে। 'বিশ্বাস' থাকলে মানুষ জয়ী হতে পারে। আর আশাবাদী আশা হল মানুষের অলংকার যেটা না থাকলে সামনের দিকে এগোতে পারবে না।

শুনেছি একটা ব্যর্থতা নাকি চারটে সফলতার সমান। জানিনা আর কোন দিন পারব কিনা উঠে দাঁড়াতে... আমি এখন যাচ্ছি দিল্লীতে নকল পা লাগাতে। তবে আমি এখনো স্বপ্ন দেখি আমি একজন বড় ক্রিকেটার হব।

"স্বপ্ন মানুষকে আবার নতুন করে বাঁচতে শিখায়।"

দাদা তুমি মন খারাপ কর না তুটি একদিন ঠিক পারবে খোলা আকাশে শঙ্খচিলের মতো উড়ে যেতে। তুমি হবে আগামী সমাজের এক অনুপ্রেরণা।

হঠাৎ স্টেশন থেমে গেল। ——

দাদা বলল আমার স্টেশন চলে এসেছে। দাদার পাশে দাদার মা ছিল। দাদাকে হুইল চেয়ারে করে নিয়ে চলে গেল।

স্টেশনটি ছেড়ে চলে গেল পী ..... পী ..... শব্দ করতে। দাদার স্মৃতিটি কেমন আবছা হয়ে গেল। শুধু স্মৃতিতে রয়ে গেল দাদার সেই কথাগুলো।

কথা বলতে বলতে কখন যে দাদা বলে ফেললাম বুঝতেই পারি নি।

অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল —— দাদার কথা আর তেমন মনেও পড়ে না।

হঠাৎ একদিন কাকু বসে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে ডেকে বলে উঠল দেখ। দেখ। কেমন নকল দুটো পা দিয়ে বিশ্ব জয় করল।

আমি তখন খুব একটা কানে নিলাম না। তারপর হঠাৎ চোখটা পড়ে গেল ছবিটার দিকে। ছবিটা দেখে গা শিউরে উঠল।

দেখতে পেলাম সেই দাদা দুটি নকল পা লাগিয়ে কীভাবে বিশ্ব জয় করল। দাদার সেই কথাটা খুব মনে পড়ল।

'যদি আকাশে উড়তে পারতাম'।

সত্যি দাদা একদিন তাই করে দেখাল। ভাবলাম একদিন যাব দাদার সাথে দেখা করতে। কিন্তু দাদা কী আমায় চিনতে পারবে। খবরের কাগজে দাদার ঠিকানা দেখে একদিন যাব।

ঠিকানা দেখে একদিন গেলাম দাদার সাথে দেখা করতে। দাদা আমাকে চিনতে পারবে তো?

দাদা দেখেই চিনতে পেরে গেল। ভাই তুই!

আমি অবাক হয়ে গেলাম! ভাই ডাকটা শুনে। আসলে আমার দাদা অনেক দিন আগে মারা গেছে। দাদার সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম। সব মনে আছে দাদার।

দাদার সাথে দেখা করে বেরিয়ে চলে গেলাম। যেতে যেতে ভাবছি। অঅমিও যদি উড়তে পারতাম খোলা আকাশে। দাদার কথাগুলো বার বার মনে পড়ছিল মানুষ স্বপ্ন আর আশা নিয়েই বাঁচে। 'আমিও একদিন উড়ব খোলা আকাশে।'

"আমিও একদিন উড়ব খোলা আকাশে, খোলা আকাশে।"

Mahishadal Raj College Student's

University Athletics Meet

1500m Run 3rd : Khuku Khatun
1500m Run 3rd : Rabi Sankar Adak
800m Run 3rd : Khuku Khatun
400m Run 1st : Sukhamay Roy
400m Run 2nd : Rabi Sankar Adak
400m Run 2nd : Khuku Khatun

Relay Team (3rd)

Khuku Khatun
Sangita Jana
Shreya Maji
Sujata Rani Sing

COLLEGE ATHLETICS MEET

100m RUN (BOYS)
1st : Sukhamay Roy
2nd : Subhajit Manna
3rd : Subhom Soham Samanta

100m RUN (GIRLS)
1st : Sangita Jana
2nd : Supriya Mallick
3rd : Kabita Mahato

1600m RUN (BOYS)
1st : Rabisankar Adak
2nd : Amit Bera
3rd : Subhadip Ghorai

1600m RUN (GIRLS)
1st : Khuku Khatun
2nd : Sampa Sasmal
3rd : Priyanka Maity

SHORT PUT (BOYS)
1st : Arup Naskar
2nd : Samiran Maity
3rd : Saikat Bhowmik

SHORT PUT (GIRLS)
1st : Laxmi Das
2nd : Rashmi Sha
3rd : Sampurna Sahu

JAVLIN THROW (BOYS)
1st : Arpan Khanra
2nd : Rahul Barik
3rd : Subha Mondal

JAVLIN THROW (GIRLS)
1st : Reshmi Sah
2nd : Rajasri Samanta
3rd : Rita Mandal

LONG JUMP (BOYS)
1st : Rampada Dolai
2nd : Sukhamay Roy
3rd : Sk. Najir

Mahishadal Raj College Student's

University Athletics Meet

1500m Run 3rd : Khuku Khatun
1500m Run 3rd : Rabi Sankar Adak
800m Run 3rd : Khuku Khatun
400m Run 1st : Sukhamay Roy
400m Run 2nd : Rabi Sankar Adak
400m Run 2nd : Khuku Khatun

Relay Team (3rd)

Khuku Khatun
Sangita Jana
Shreya Maji
Sujata Rani Sing

COLLEGE ATHLETICS MEET

100m RUN (BOYS)
1st : Sukhamay Roy
2nd : Subhajit Manna
3rd : Subhom Soham Samanta

100m RUN (GIRLS)
1st : Sangita Jana
2nd : Supriya Mallick
3rd : Kabita Mahato

1600m RUN (BOYS)
1st : Rabisankar Adak
2nd : Amit Bera
3rd : Subhadip Ghorai

1600m RUN (GIRLS)
1st : Khuku Khatun
2nd : Sampa Sasmal
3rd : Priyanka Maity

SHORT PUT (BOYS)
1st : Arup Naskar
2nd : Samiran Maity
3rd : Saikat Bhowmik

SHORT PUT (GIRLS)
1st : Laxmi Das
2nd : Rashmi Sha
3rd : Sampurna Sahu

JAVLIN THROW (BOYS)
1st : Arpan Khanra
2nd : Rahul Barik
3rd : Subha Mondal

JAVLIN THROW (GIRLS)
1st : Reshmi Sah
2nd : Rajasri Samanta
3rd : Rita Mandal

LONG JUMP (BOYS)
1st : Rampada Dolai
2nd : Sukhamay Roy
3rd : Sk. Najir

LONG JUMP (GIRLS)
1st : Sujata Rani Singha
2nd : Sangita Jana
3rd : Shilpa Bera

200m RUN (BOYS)
1st : Sukhamay Roy
2nd : Subhajit Manka
3rd : Subham Som Samanta

200m RUN (GIRLS)
1st : Shreya Maji
2nd : Supriya Mallick
3rd : Chhanda Samanta

400m RUN (BOYS)
1st : Subhajit Manna
2nd : Rabisankar Adak
3rd : Mujibar Mallick

400m RUN (GIRLS)
1st : Khuku Khatun
2nd : Sampa Sasmal
3rd : Shreya Maji

800m RUN (BOYS)
1st : Rabisankar Adak
2nd : Amit Bera
3rd : Subhadip Ghorai

800m RUN (GIRLS)
1st : Khuku Khatun
2nd : Shreya Maji
3rd : Nikat Aktar

DISCHS THROW(GIRLS)
1st : Rekha Bauri
2nd : Mamta Debnath
3rd : Ananya Ghorai

DISCHS THROW(BOYS)
1st : Bipul Halder
2nd : Debabrata Singha
3rd : Arpan Khanra

HIGH JUMP (BOYS)
1st : Mangal Maity
2nd : Pritam Jana
3rd : Rahul Barik

HIGH JUMP (GIRLS)
1st : Sujata Rani Singha
2nd : Shilpa Bera
3rd : Sampurna Mondal

400m RELAY (BOYS)
1st : Mangal Maity, Ramapada Dolai, Mujibar Mallick, Subham Som Samanta
2nd : Rabisankar Adak, Amit Bera, Subhajit Manna, Subhajit Ghorai
3rd : Pritam Jana, Rahul Barik, Jayabrata Jana, Sudipta Bera

400m RELAY (GIRLS)
1st : Khuku Khatun, Sangita Jana, Supriya Mallick, Shreya Maji
2nd : Sujata Rani Singha, Rajasri Samanta, Jaheda Khatun, Sampa Sasmal
3rd : Sangita Guria, Anindita Maity, Nikhat Aktar, Rimjhim Adak

HIT THE WICKET (TEACHERS)
1st : Debasis Saska
2nd : Pradip Das
3rd : Rakesh Chobe

50 m WALKING
(STAFF)

1st : Dolan -----
2nd : Nandadulal Mondal
3rd : Joydev Manna

SHORT PUT (EX STUDENT)

1st : Abirbad Adak
2nd : Buddhadev Das
3rd : Rohit Mondal

SHORT PUT (EX STUDENT)

1st : Abirbad Adak
2nd : Buddhadev Das
3rd : Rohit Mondal

FOOTBALL TEAM 5TH SEM
(CHAMPION)

Rajdeep Handa, Sayan Santra, Sk Najir, Pritam Jana, Souris Singha, Soumen Kumar Mal, Arup Naskar, Shamarpan Purkait, Joyjit Bera, Souvik Patra, Sk Farid Ali, Sk Aslam Pervej, Shyamsundar Manna, Tanmoy Mondal, Palash Mandal

FOOTBALL TEAM 3RD SEM
(RUNNERS)

Subhankar Manna, Rampada Dolai, Souvik Bera, Sourav Halder, Sk Suroj, Arpan Acharya, Kuntal Mondal, Santanu Bhunia, Surajit Das, Subham Adhikary, Sourav Mondal, Sk Samim

Garh Kamalpur, West Bengal | Aug 31, 2023,

Garh Kamalpur, West Bengal | Aug 31, 2023,

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০২৪

● রবীন্দ্র সঙ্গীত
প্রথম ঃ— সহেলী পন্ডা
দ্বিতীয় ঃ— রিন্টু সামই
তৃতীয় ঃ— মহুয়া মাইতি

● নজরুল সঙ্গীত
প্রথম ঃ— পারমিতা অধিকারী
দ্বিতীয় ঃ— মনিষা বেরা
তৃতীয় ঃ— সহেলী পন্ডা

● লোক সঙ্গীত
প্রথম ঃ— সহেলী পন্ডা
দ্বিতীয় ঃ— পারমিতা অধিকারী
তৃতীয় ঃ— তরুণ অধিকারী ও সুপ্রিতা অধিকারী

● আধুনিক সঙ্গীত
প্রথম ঃ— পারমিতা অধিকারী
দ্বিতীয় ঃ— মহুয়া মাইতি
তৃতীয় ঃ— রিন্টু সামুই

● অনুগল্প লিখন
প্রথম ঃ— দেবজিৎ সরকার
দ্বিতীয় ঃ— দিশা কর
তৃতীয় ঃ— সোমা রাণী মাইতি

● স্বচরিত কবিতা লিখন
প্রথম ঃ— নয়না প্রামানিক
দ্বিতীয় ঃ— দিশা কর
তৃতীয় ঃ— সুমন মাইতি

● স্বচরিত গল্প লিখন
প্রথম ঃ—সুমন মাইতি
দ্বিতীয় ঃ— বিজয় দাস
তৃতীয় ঃ— সোমারাণী মাইতি

● হরবোলা প্রতিযোগিতা
প্রথম ঃ— তনুজা খাতুন
দ্বিতীয় ঃ— নয়না প্রামানিক
তৃতীয় ঃ— বৃষ্টি মহাপাত্র

● রবীন্দ্র নৃত্য
প্রথম ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী
দ্বিতীয় ঃ— পিয়াশা মন্ডল
তৃতীয় ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই

● আধুনিক নৃত্য
প্রথম ঃ— পিয়াশা মন্ডল
দ্বিতীয় ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই
তৃতীয় ঃ— সুচিত্রা নায়েক

● লোক নৃত্য
প্রথম ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী
দ্বিতীয় ঃ— পিয়াশা মন্ডল
তৃতীয় ঃ— সুচিত্রা নায়েক

● রঙ্গোলী প্রতিযোগিতা
প্রথম ঃ— সুমন দাস
দ্বিতীয় ঃ— কোয়েল প্রামানিক
তৃতীয় ঃ— অনিন্দিতা মাইতি

● রবীন্দ্র কবিতা
প্রথম ঃ— সুজাতা ধাড়া
দ্বিতীয় ঃ— ছন্দা সামন্ত
তৃতীয় ঃ— শ্রেয়সী বেরা

● আধুনিক কবিতা
প্রথম ঃ— তনুজা খাতুন
দ্বিতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন
তৃতীয় ঃ— সুপ্রীতি ঘড়া

● দ্বৈত কবিতা পাঠ
প্রথম ঃ— সুজাতা ধাড়া ও ছন্দা সামন্ত
দ্বিতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন ও সুচিত্রা নায়েক
তৃতীয় ঃ— শ্রেয়সী বেরা ও নায়েরা প্রামানিক

● মুকাভিনয়
প্রথম ঃ— দীশা ভূঞ্যা
দ্বিতীয় ঃ— পলাশ মাইতি
তৃতীয় ঃ— সুজাতা ধাড়া

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০২৪

● রবীন্দ্র সঙ্গীত
প্রথম ঃ— সহেলী পন্ডা
দ্বিতীয় ঃ— রিন্টু সামই
তৃতীয় ঃ— মহুয়া মাইতি

● নজরুল সঙ্গীত
প্রথম ঃ— পারমিতা অধিকারী
দ্বিতীয় ঃ— মনিষা বেরা
তৃতীয় ঃ— সহেলী পন্ডা

● লোক সঙ্গীত
প্রথম ঃ— সহেলী পন্ডা
দ্বিতীয় ঃ— পারমিতা অধিকারী
তৃতীয় ঃ— তরুণ অধিকারী ও সুপ্রিতা অধিকারী

● আধুনিক সঙ্গীত
প্রথম ঃ— পারমিতা অধিকারী
দ্বিতীয় ঃ— মহুয়া মাইতি
তৃতীয় ঃ— রিন্টু সামুই

● অনুগল্প লিখন
প্রথম ঃ— দেবজিৎ সরকার
দ্বিতীয় ঃ— দিশা কর
তৃতীয় ঃ— সোমা রাণী মাইতি

● স্বচরিত কবিতা লিখন
প্রথম ঃ— নয়না প্রামানিক
দ্বিতীয় ঃ— দিশা কর
তৃতীয় ঃ— সুমন মাইতি

● স্বচরিত গল্প লিখন
প্রথম ঃ—সুমন মাইতি
দ্বিতীয় ঃ— বিজয় দাস
তৃতীয় ঃ— সোমারাণী মাইতি

● হরবোলা প্রতিযোগিতা
প্রথম ঃ— তনুজা খাতুন
দ্বিতীয় ঃ— নয়না প্রামানিক
তৃতীয় ঃ— বৃষ্টি মহাপাত্র

● রবীন্দ্র নৃত্য
প্রথম ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী
দ্বিতীয় ঃ— পিয়াশা মন্ডল
তৃতীয় ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই

● আধুনিক নৃত্য
প্রথম ঃ— পিয়াশা মন্ডল
দ্বিতীয় ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই
তৃতীয় ঃ— সুচিত্রা নায়েক

● লোক নৃত্য
প্রথম ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী
দ্বিতীয় ঃ— পিয়াশা মন্ডল
তৃতীয় ঃ— সুচিত্রা নায়েক

● রঙ্গোলী প্রতিযোগিতা
প্রথম ঃ— সুমন দাস
দ্বিতীয় ঃ— কোয়েল প্রামানিক
তৃতীয় ঃ— অনিন্দিতা মাইতি

● রবীন্দ্র কবিতা
প্রথম ঃ— সুজাতা ধাড়া
দ্বিতীয় ঃ— ছন্দা সামন্ত
তৃতীয় ঃ— শ্রেয়সী বেরা

● আধুনিক কবিতা
প্রথম ঃ— তনুজা খাতুন
দ্বিতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন
তৃতীয় ঃ— সুপ্রীতি ঘড়া

● দ্বৈত কবিতা পাঠ
প্রথম ঃ— সুজাতা ধাড়া ও ছন্দা সামন্ত
দ্বিতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন ও সুচিত্রা নায়েক
তৃতীয় ঃ— শ্রেয়সী বেরা ও নায়েরা প্রামানিক

● মুকাভিনয়
প্রথম ঃ— দীশা ভূঞ্যা
দ্বিতীয় ঃ— পলাশ মাইতি
তৃতীয় ঃ— সুজাতা ধাড়া

বিজ্ঞান পরিষদীয় প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০২৪

● প্রবন্ধ রচনা

প্রথম ঃ— বিজয় দাস
দ্বিতীয় ঃ— লিশা ডাল
তৃতীয় ঃ— পার্থ ভৌমিক

● অঙ্কন

প্রথম ঃ— কেয়া কুইতি
দ্বিতীয় ঃ— মোনালিসা হাসদার
তৃতীয় ঃ— ঈতিকা ঘোড়ই

● সংবাদ পাঠ

প্রথম ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন
দ্বিতীয় ঃ— গ্রন্থিকা চক্রবর্তী
তৃতীয় ঃ— অনন্যা মান্না

● বিতর্ক প্রতিযোগিতা

প্রথম ঃ— বিজয় দাস
দ্বিতীয় ঃ— অঞ্জনা হাইত
তৃতীয় ঃ— সুদীপ কামিল্যা

● তাৎক্ষনিক বক্তব্য

প্রথম ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন
দ্বিতীয় ঃ— অঞ্জনা হাইতি
তৃতীয় ঃ— দেবাশিষ বারিক

● বিজ্ঞানের স্লোগান রচনা

প্রথম ঃ— সৌমদ্বীপ মন্ডল
দ্বিতীয় ঃ— পার্থ ভৌমিক
তৃতীয় ঃ— অঙ্কনা ভৌমিক

● অনস্পট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

প্রথম ঃ— বিজয় দাস
দ্বিতীয় ঃ— সৌমি মাইতি
তৃতীয় ঃ— সজল পাত্র

● আন্তঃ মহাবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

প্রথম ঃ— প্রদীপ কুমার গুচ্ছাইত
সুবীর চন্দ্র বেরা
অর্ণব সাঁই
দ্বিতীয় ঃ— চয়ন কুমার জানা
আসফাক মল্লিক
তৃতীয় ঃ— অর্পন মহাপাত্র
লক্ষ্মীপ্রিয়া মাইতি
অনুপম দাস

Common Room Compitition - 2024

Boy's Carrom (Single)
1st : Srinjoy Patra
2nd : Soumadip Mondal

Boy's Carrom (Double)
Champion : Srinjoy Patra
Biswajit Rana
Runners : Aniket Bhowmik
Sk Sahajamal

Mix Carrom (Double)
Champion : Soumen Mal
Susmita Samanta
Runners : Pabitra Pal
Bristy Mahapatra

Girl's Carrom (Single)
1st : Susmita Samanta
2nd : Khuku Khatua

Girl's Ludu (Single)
Champion : Susmita Halder
Runners : Mira Giri

Girl's Ludu (Double)
1st : Sumana Jana
Suchitra Jana
2nd : Sujata Dhara
Nusrin Nahar Khan

Chess
1st : Rajarshi Bhowmik
2nd : Anujit Jana

Common Room Compitition - 2024

Boy's Carrom (Single)
1st : Srinjoy Patra
2nd : Soumadip Mondal

Boy's Carrom (Double)
Champion : Srinjoy Patra
Biswajit Rana
Runners : Aniket Bhowmik
Sk Sahajamal

Mix Carrom (Double)
Champion : Soumen Mal
Susmita Samanta
Runners : Pabitra Pal
Bristy Mahapatra

Girl's Carrom (Single)
1st : Susmita Samanta
2nd : Khuku Khatua

Girl's Ludu (Single)
Champion : Susmita Halder
Runners : Mira Giri

Girl's Ludu (Double)
1st : Sumana Jana
Suchitra Jana
2nd : Sujata Dhara
Nusrin Nahar Khan

Chess
1st : Rajarshi Bhowmik
2nd : Anujit Jana

Common Room Compitition - 2024

Boy's Carrom (Single)
1st : Srinjoy Patra
2nd : Soumadip Mondal

Boy's Carrom (Double)
Champion : Srinjoy Patra
Biswajit Rana
Runners : Aniket Bhowmik
Sk Sahajamal

Mix Carrom (Double)
Champion : Soumen Mal
Susmita Samanta
Runners : Pabitra Pal
Bristy Mahapatra

Girl's Carrom (Single)
1st : Susmita Samanta
2nd : Khuku Khatua

Girl's Ludu (Single)
Champion : Susmita Halder
Runners : Mira Giri

Girl's Ludu (Double)
1st : Sumana Jana
Suchitra Jana
2nd : Sujata Dhara
Nusrin Nahar Khan

Chess
1st : Rajarshi Bhowmik
2nd : Anujit Jana

মহিষাদল রাজ কলেজ পত্রিকা - ২০২৩-২০২৪

বিগত বর্ষপত্র সম্পাদকগণের তালিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকা	ছাত্রছাত্রী
'৭৩-৭৪ —অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	ভোলানাথ সামন্ত
'৭৫-৭৬ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	মানসী আচার্য
'৭৬-৭৭ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	? ?
'৭৭-৭৮ —অধ্যাপক তাপস মুখোপাধ্যায়	অমল দাস
'৭৮-৭৯ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার	অসিত কুমার মাইতি
৮০-৮১ —অধ্যক্ষ বিভূতি ভূষণ সেন	স্বপন কুমার দাস
৮১-৮২ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	কল্যাণ কুমার মাইতি
৮২-৮৩ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	শোভা কুমার মাইতি
৮৩-৮৪ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	নিশীথ কুমার জানা
৮৪-৮৫ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	নেপাল মেটা
৮৫-৮৬ — অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র মাইতি	দিপালী অধিকারী
৮৬-৮৭ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	পূর্ণেন্দু জানা
৮৭-৮৮ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি	তাপস দাস
৮৮-৮৯ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	সীতেশ দাস
৮৯-৯০— অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	দেবাশীষ সামন্ত
৯০-৯১ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী	প্রণব সামন্ত
৯১-৯২ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম	দেবাশীষ গায়েন
৯২ ৯৩ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম	অস্মিতা খাঁড়া
৯৩-৯৪ —অধ্যাপক তপন কুমার সাহু	আশিষ গায়েন
৯৪-৯৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	আশিস খাঁড়া
৯৫- ৯৬ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	শীলা পাত্র
৯৬-৯৭ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী	লালবাহাদুর বিজলী
৯৭-৯৮ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী	কমল পারিয়াল
৯৯-২০০ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	উত্তম কুমার পাল
২০০০-২০০১ — প্রভাস কুমার রায়	সাথী দাস
২০০১-২০০২ —অধ্যাপক শুভময় দাস	পবিত্র সাহু
২০০২-২০০৩— অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি	সর্বেশ্বর মল্লিক
২০০৩-২০০৪ — অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি	গোপাল বেজ
২০০৪-২০০৫ —অধ্যাপক শুভময় দাস	কাবেরি শর্মা
২০০৫-২০০৬ — আশীষ দে	মৌমিতা বেরা
২০০৬-২০০৭ — অধ্যাপিকা শ্যামা জানা (গিরি)	প্রিয়াংকা দাস
২০০৭-২০০৮ — ,, শ্যামা জানা (গিরি)	যুথিকা দাস
২০০৮-২০০৯ — অধ্যাপক ডঃ শেখর ভৌমিক	প্রসেনজিৎ মান্না
২০০৯-২০১০ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	শুভ মাইতি
২০১০-২০১১ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	নাগমা খাতুন
২০১১-২০১২ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	অতনু জানা
২০১২-২০১৩ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	মমতা বারিক
২০১৩-২০১৪ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ	বিমল মাইতি
২০১৪-২০১৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায়	গোপাল রাণা
২০১৬-২০১৭ — অধ্যাপক শুমিপর্ণা মাইতি	বাপ্পাদিত্য বেরা
২০১৭-২০১৮ — অধ্যাপক শুভময় দাস.	সায়ন আচার্য্য
২০১৯-২০২০ — অধ্যাপক সমীর কুমার পাত্র	জয়মাল্য সামন্ত
২০২০-২০২৩ — অধ্যাপক ড. শুভময় দাস .	আরবাজ খাঁন

ছাত্র সংসদ

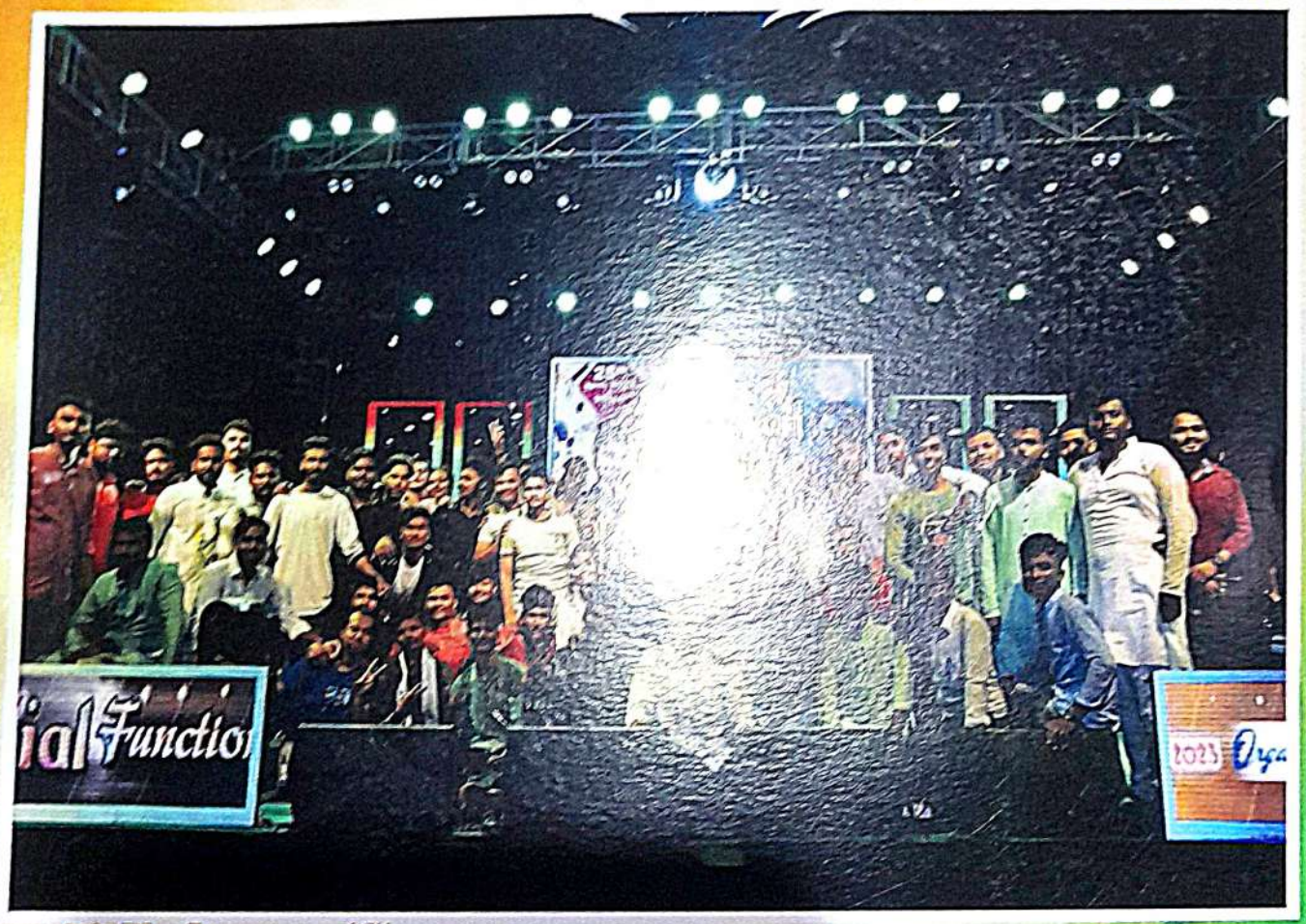

ছাত্র সংসদ

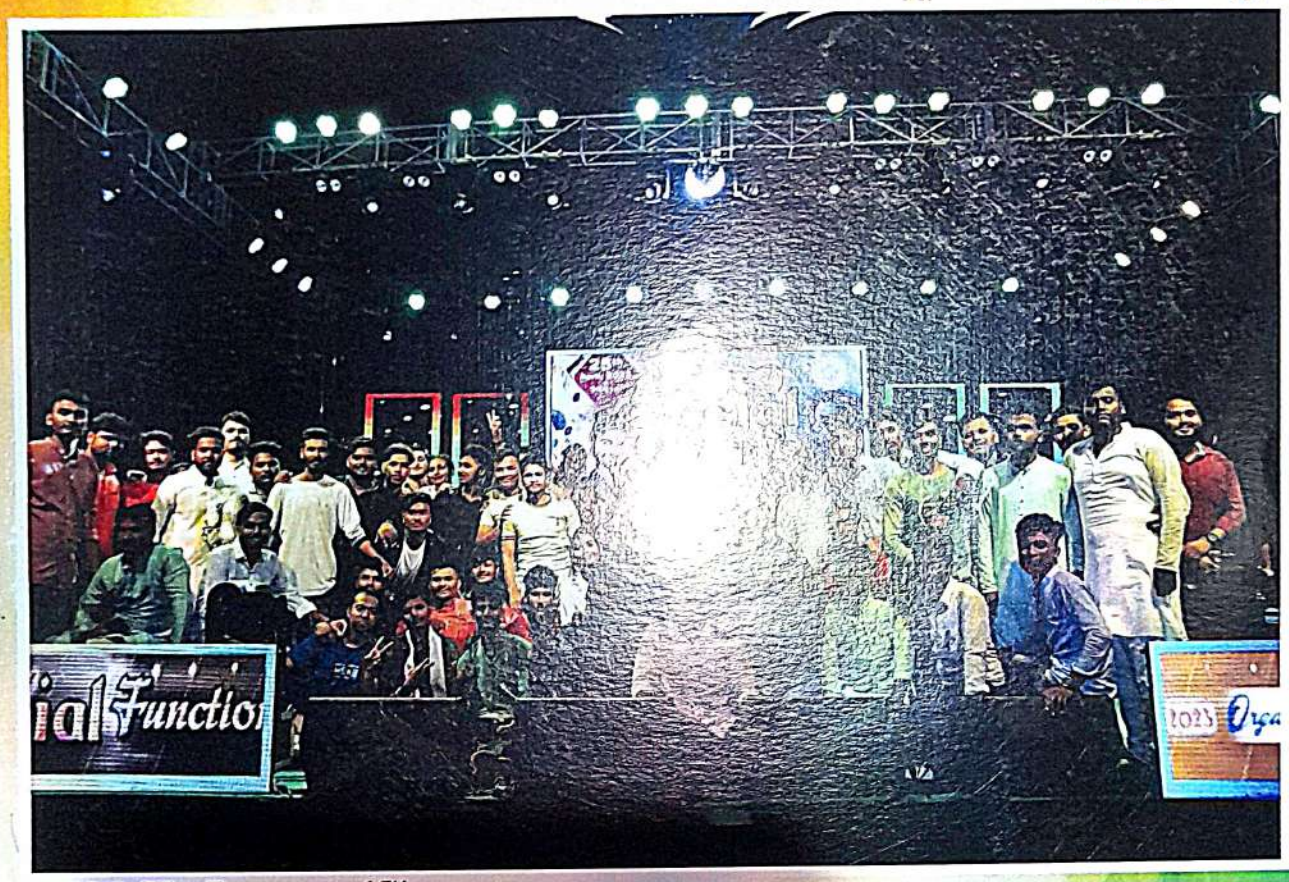

ছাত্র সংসদের বিগত বর্ষের সাধারণ সম্পাদকগণের তালিকা

১৯৭১-৭২	একরামুল মাইতি	১৯৯৭-৯৮	শ্রী কমলেশ মিশ্র
১৯৭২-৭৩	শেখ আব্দুল জব্বার খাঁন	১৯৯৮-৯৯	শ্রী কমলেশ মিশ্র
১৯৭৩-৭৪	নির্বাচন হয় নাই	১৯৯৯-২০০০	শ্রী [illegible]
১৯৭৪-৭৫	নির্বাচন হয় নাই	২০০০-২০০১	শ্রী উত্তম কুমার বেরা
১৯৭৫-৭৬	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী	২০০১-২০০২	শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য
১৯৭৬-৭৭	শ্রী প্রদীপ কুমার বেরা	২০০২-২০০৩	শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য
১৯৭৭-৭৮	শ্রী জহরলাল প্রামানিক		শ্রী সুব্রত ভুঞ্যা
১৯৭৮-৭৯	জ্যোতির্ময় ঘোষ	২০০৩-২০০৪	শ্রী পার্থজিৎ মান্না
১৯৮০-৮১	শ্রী অরবিন্দ নায়েক	২০০৪-২০০৫	শ্রী দেবব্রত সামন্ত
১৯৮১-৮২	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী		শ্রী দেবাশিস ডাকুয়া
১৯৮২-৮৩	শ্রী সমর চক্রবর্ত্তী	২০০৫-২০০৬	শ্রী সুব্রত কুমার দাস
১৯৮৩-৮৪	দিলীপ কুমার বেরা	২০০৬-২০০৭	শ্রী বিশ্বজিৎ সামন্ত
১৯৮৪-৮৫	শ্রী অমল কুমার মাজী	২০০৭-২০০৮	শ্রী পিন্টু দাস
১৯৮৫-৮৬	শ্রী বলদেব রায়	২০০৮-২০০৯	শ্রী অর্পণ চক্রবর্ত্তী
১৯৮৬-৮৭	শ্রী বলদেব রায়	২০০৯-[illegible]	[illegible] মাজী
১৯৮৭-৮৮	শ্রী পূর্ণেন্দু জানা	২০১০-[illegible]	[illegible] কুমার মাইতি
১৯৮৮-৮৯	শ্রী অমল কুমার মাজী	২০১১-[illegible]	[illegible] নায়েক
১৯৮৯-৯০	শ্রী নীরেশ দাস		[illegible] পট্টনায়ক
১৯৯০-৯১	জহরলাল ভূঞ্যা	২০১২-[illegible]	[illegible] মণ্ডল
১৯৯১-৯২	তপন কুমার পাড়িয়া		[illegible] সমাজী
১৯৯২-৯৩	শ্রী শিবপ্রসাদ বেরা	২০১৩-২০১৪	শ্রী রাকেশ মণ্ডল
১৯৯৩-৯৪	শ্রী মলয় কুমার দাস	২০১৪-২০১৫	শ্রী রোহিত মণ্ডল
১৯৯৪-৯৫	শ্রী প্রকাশানন্দ পালধি	২০১৭-২০১৮	শ্রী সুরজ মল্লিক
১৯৯৫-৯৬	শ্রী মলয় কুমার দাস	২০১৮-২০১৯	শ্রী প্রকাশ পাল
১৯৯৬-৯৭	শ্রী তপন মণ্ডল	২০১৯-২০২২	শ্রী তরুজিৎ ভূঞ্যা
		২০২২-২০২৩	শ্রী সোহম মণ্ডল

বর্তমান বৎসর (২০২৩-২০২৪) শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না

ছাত্র সংসদের বিগতবর্ষের সাধারণ সম্পাদকগণদের তালিকা

১৯৭১-৭২	গুরুপ্রিয় মাইতি
১৯৭২-৭৩	সেক আব্দুল জব্বার আলি
১৯৭৩-৭৪	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৪-৭৫	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৫-৭৬	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৭৬-৭৭	শ্রী প্রদীপ কুমার বেরা
১৯৭৭-৭৮	শ্রী জহরলাল প্রামাণিক
১৯৭৮-৭৯	জ্যোতির্ময় হোড়
১৯৮০-৮১	শ্রী অরবিন্দ নায়েক
১৯৮১-৮২	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৮২-৮৩	শ্রী সনৎ চক্রবর্তী
১৯৮৩-৮৪	দিলীপ কুমার বেরা
১৯৮৪-৮৫	শ্রী অমল কুমার মাজী
১৯৮৫-৮৬	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৬-৮৭	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৭-৮৮	শ্রী পূর্ণেন্দু জানা
১৯৮৮-৮৯	শ্রী অমল কুমার মাজী
১৯৮৯-৯০	শ্রী সীতেশ দাস
১৯৯০-৯১	জহরলাল ভূঞ্যা
১৯৯১-৯২	স্বপন কুমার পড়িয়া
১৯৯২-৯৩	শ্রী শিবপ্রসাদ বেরা
১৯৯৩-৯৪	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৪-৯৫	শ্রী স্বরূপানন্দ পালধি
১৯৯৫-৯৬	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৬-৯৭	শ্রী তপন মণ্ডল
১৯৯৭-৯৮	শ্রী কল্যাণ মিশ্র
১৯৯৮-৯৯	শ্রী কল্যাণ মিশ্র
১৯৯৯-২০০০	শ্রী কল্যাণ কাঞ্জিলাল
২০০০-২০০১	শ্রী উত্তম কুমার পাল
২০০১-২০০২	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী
২০০২-২০০৩	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী
	শ্রী সুজয় কুইল্যা
২০০৩-২০০৪	শ্রী অভিজিৎ মান্না
২০০৪-২০০৫	শ্রী সৈকত সামন্ত
	শ্রী দেবাশিষ হাজরা
২০০৫-২০০৬	শ্রী সুব্রত কুমার দাস
২০০৬-২০০৭	শ্রী অনিন্দ্য সামন্ত
২০০৭-২০০৮	শ্রী শিবু খাঁড়া
২০০৮-২০০৯	শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী
২০০৯-২০১০	শ্রী সুরেন্দু মান্না
২০১০-২০১১	দীপক কুমার মাইতি
২০১১-২০১২	দেবাশিষ শাসকা
	নন্দন পট্টনায়ক
২০১২-২০১৩	মর মণ্ডল
	ম সমাজী
২০১৩-২০১৪	শ্রী রাকেশ মণ্ডল
২০১৪-২০১৬	শ্রী রোহিত মণ্ডল
২০১৭-২০১৮	শ্রী সুরজ মল্লিক
২০১৮-২০১৯	শ্রী প্রকাশ পান
২০১৯-২০২২	শ্রী শুভজিৎ কুইল্যা
২০২২-২০২৩	শ্রী সোহম মণ্ডল

বর্তমান বৎসর (২০২৩-২০২৪) শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না

ছাত্র সংসদের বিগতবর্ষের সাধারণ সম্পাদকগণদের তালিকা

১৯৭১-৭২	গুরুপ্রিয় মাইতি
১৯৭২-৭৩	সেক আব্দুল জব্বার আলি
১৯৭৩-৭৪	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৪-৭৫	নির্বাচন হয় নাই
১৯৭৫-৭৬	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৭৬-৭৭	শ্রী প্রদীপ কুমার বেরা
১৯৭৭-৭৮	শ্রী জহরলাল প্রামাণিক
১৯৭৮-৭৯	জ্যোতির্ময় হোড়
১৯৮০-৮১	শ্রী অরবিন্দ নায়েক
১৯৮১-৮২	শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী
১৯৮২-৮৩	শ্রী সনৎ চক্রবর্তী
১৯৮৩-৮৪	দিলীপ কুমার বেরা
১৯৮৪-৮৫	শ্রী অমল কুমার মাজী
১৯৮৫-৮৬	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৬-৮৭	শ্রী বনদেব রায়
১৯৮৭-৮৮	শ্রী পূর্ণেন্দু জানা
১৯৮৮-৮৯	শ্রী অমল কুমার মাজী
১৯৮৯-৯০	শ্রী সীতেশ দাস
১৯৯০-৯১	জহরলাল ভূঞ্যা
১৯৯১-৯২	স্বপন কুমার পড়িয়া
১৯৯২-৯৩	শ্রী শিবপ্রসাদ বেরা
১৯৯৩-৯৪	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৪-৯৫	শ্রী স্বরূপানন্দ পালধি
১৯৯৫-৯৬	শ্রী মলয় কুমার দাস
১৯৯৬-৯৭	শ্রী তপন মণ্ডল
১৯৯৭-৯৮	শ্রী কল্যাণ মিদ্যা
১৯৯৮-৯৯	শ্রী কল্যাণ মিদ্যা
১৯৯৯-২০০০	শ্রী কল্যাণ কাঞ্জিলাল
২০০০-২০০১	শ্রী উত্তম কুমার পাল
২০০১-২০০২	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী
২০০২-২০০৩	শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী
	শ্রী সুজয় কুইল্যা
২০০৩-২০০৪	শ্রী অভিজিৎ মান্না
২০০৪-২০০৫	শ্রী সৈকত সামন্ত
	শ্রী দেবাশিষ হাজরা
২০০৫-২০০৬	শ্রী সুব্রত কুমার দাস
২০০৬-২০০৭	শ্রী অনিন্দ্য সামন্ত
২০০৭-২০০৮	শ্রী শিবু খাঁড়া
২০০৮-২০০৯	শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী
২০০৯-২০১০	শ্রী সুরেন্দু মান্না
২০১০-২০[illegible]	[illegible]পক কুমার মাইতি
২০১১-২[illegible]	[illegible]বাশিষ শাসকা
	[illegible]বনন্দন পট্টনায়ক
২০১২-২০[illegible]	[illegible]র মণ্ডল
	[illegible]ত্তম সমাজী
২০১৩-২০১৪	শ্রী রাকেশ মণ্ডল
২০১৪-২০১৬	শ্রী রোহিত মণ্ডল
২০১৭-২০১৮	শ্রী সুরজ মল্লিক
২০১৮-২০১৯	শ্রী প্রকাশ পাল
২০১৯-২০২২	শ্রী শুভজিৎ কুইল্যা
২০২২-২০২৩	শ্রী সোহম মণ্ডল

বর্তমান বৎসর (২০২৩-২০২৪) শ্রী শ্যামসুন্দর মান্না